قال الله تعالى وما اتيكم الرسول فخذوه ق ومانهبكم عنه فانتهوا ج

মা'আরিফুল হাদীস

হাদীসে নববীর এক নতুন ও অনুপম সংকলন

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ

প্রথম খন্ড

কিতাবুল ঈমান

সংকলন ঃ
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ
হাফেয মাওলানা মুজীবুর রহমান
শায়খুল হাদীস, মাদরাসা দারুল উলূম
মিরপুর-৬, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর যে অগণিত দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি তাদের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য নবুওয়ত ও রেসালতের মহান ও মুবারক ধারা চালু করেছেন এবং যখনই মানবজাতির জন্য আসমানী হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখন তাদের মধ্য থেকেই কোন এক বান্দাকে নিজের নবী এবং তাদের পথপ্রদর্শক বানিয়ে আপন হেদায়াতসহ তাদের মধ্যে প্রেরণ করে দিয়েছেন।

নবী-রাসূলদের আগমনের এই ধারা হাজার হাজার বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই ধারাকে সমাপ্ত করে দেওয়া হয় এবং তাঁর মাধ্যমে সেই সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও হেদায়াত প্রেরণ করা হয়, যা সর্বকালের জন্য যথেষ্ট।

আসমানী শিক্ষা ও হেদায়াতের যে মহাসম্পদ খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এই জগত লাভ করেছে, এর দু'টি অংশ রয়েছে। একটি আল্লাহ্র কিতাব কুরআন মজীদ, যা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই আল্লাহ্র কালাম। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব বাণী এবং তাঁর সকল বাচনিক ও বাস্তব কর্মধারা সংক্রান্ত শিক্ষা ও পথনির্দেশ, যা তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর কিতাবের শিক্ষক ও ব্যাখ্যাতা এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিনিধি হিসাবে উম্মতকে দান করতেন। সাহাবায়ে কেরাম এগুলো সংরক্ষণ করে উম্মতের পরবর্তী লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং পরবর্তী লোকেরা এগুলো পূর্ণ বর্ণনা পরম্পরার সাথে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ করে নিয়েছেন। তাঁর এ শিক্ষা ও পথ নির্দেশের শিরোনাম হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজের স্বাভাবিক জীবন কাটিয়ে আল্লাহ্র ফায়সালা অনুযায়ী এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন; কিন্তু বিশ্বমানবের চিরকালীন পথপ্রদর্শনের জন্য নিজের আনীত শিক্ষা ও হেদায়াতের এই দু'টি অংশ অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহকে রেখে গিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি বিষয়কে (নিজ নিজ স্তর অনুযায়ী) প্রত্যেক যুগে সংরক্ষিত ও সমুজ্জ্বল রাখার এমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা করেছেন যে, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এটা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক

বিরাট নিদর্শন এবং খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযাসমূহের মধ্যে এক বিরাট মু'জেযা।

আল্লাহ্‌র এসব ব্যবস্থার মধ্যে একটি ব্যবস্থা এই যে, যুগের চাহিদা অনুযায়ী কুরআন ও হাদীসের যে ধরনের খেদমতের প্রয়োজন দেখা দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিছু বান্দার অন্তরে এর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দিয়ে তাদেরকে এই খেদমতের প্রতি মনোযোগী করে দেন। নবী-যুগ থেকে শুরু করে এই কাল পর্যন্ত কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন খেদমত যেসকল ধারায় সম্পন্ন করা হয়েছে, (কেউ চিন্তার দৃষ্টিতে দেখলে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, এসব যা হয়েছে) সেটা প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের এক খোদায়ী ব্যবস্থাপনাই ছিল, আর যেসকল বান্দার মাধ্যমে এই খেদমত সম্পন্ন হয়েছে, তারা যেন কেবল যন্ত্রের ভূমিকায় ছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা যদিও খুবই চিত্তাকর্ষক ও ঈমান উদ্দীপক, কিন্তু খুবই দীর্ঘ। আর জ্ঞানীদের জন্য যেহেতু এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট, তাই আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে বলতে চাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে আমাদের এ যুগে এবং আমাদেরই দেশে তাঁর কিছু বান্দাকে দিয়ে কুরআন মজীদের এমন খেদমত করিয়েছেন, যা যুগচাহিদার দাবী ছিল। আল্লাহ্‌র শোকর যে, ঐসব বান্দার পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা ঐ সময়ের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। তদ্রূপভাবে আজ থেকে প্রায় বার বছর পূর্বে (১৩৬১ হিজরীতে) এই অধম বান্দার অন্তরে এ চিন্তা আসে যে, এই যুগের বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে উর্দু ভাষায় হাদীসে নববীরও একটা খেদমত করা হোক। আর এর জন্য প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের (ছেহাহ সিত্তা অথবা মেশকাত শরীফ ইত্যাদি) মধ্য থেকে কোন একটির ব্যাখ্যা লিখার পরিবর্তে এটা অধিক উপযোগী মনে হল যে, হাদীসে নববীর একটা মধ্যম ধরনের নতুন সংকলন এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পৃথকভাবে সাজানো হোক এবং এ যুগের সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাগত এবং চিন্তাগত অবস্থা এবং এরই সাথে বর্তমান যুগের বিশেষ বিশেষ একাডেমিক চাহিদাকে সামনে রেখে সাধারণবোধ্য ভাষায় হাদীসগুলোর ব্যাখ্যাও করা হোক। তারপর সে ইচ্ছা অনুযায়ী এ কাজের একটি চিত্র ও মাপকাঠি সামনে রেখে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সে বছরই এ কাজ শুরুও করে দিলাম। কখনো কখনো মাসিক 'আল ফুরকানে' এর কোন কোন অংশ 'মা'আরিফুল আহাদীস' শিরোনামে প্রকাশিতও হতে থাকে।

কিন্তু সেই বছরগুলো অধমের এ অবস্থা ছিল যে, কাজের গতি খুবই মন্থর থাকে; বরং মাঝে অনেক সময় এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি এ কাজের প্রতি কোন মনোযোগই দিতে পারিনি। আমি তখন নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম যে, এ কাজটি হয়তো কোন উল্লেখযোগ্য সীমা পর্যন্তই পৌঁছাতে পারবে না; কিন্তু যিনি কাজ নিবেন তাঁর ফায়সালা ছিল কাজ নেওয়ার। তাই একাধিকবার ভাঙ্গন ও মাঝে কয়েক বছরের বিরতি সত্ত্বেও কিছু কিছু কাজ হতেই থাকে। যার ফলে এই প্রথম খন্ড যা এখন ছাপা হচ্ছে, এখন থেকে দেড় বছর পূর্বেই এর কাজ একরকম শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর নিরীক্ষণ কাজের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হল। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এ কাজও হয়ে গেল। সবশেষে আল্লাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহে ছাপানোর কাজও সহজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা যদি এ কিতাবটি সমাপ্ত করার তওফীক দান করেন, তাহলে আমার মস্তিষ্কে এর যে খসড়া রয়েছে, সেই হিসাবে এ ধরনের আরো পাঁচটি খন্ডে কিতাব শেষ হবে ইনশাআল্লাহ্।

এ কিতাবের প্রথম খন্ডটি হচ্ছে কিতাবুল ঈমান। এতে কেবল ঐসব হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেগুলো ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে কেয়ামত, আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত হাদীসগুলো অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হলেও আমি কিতাবুল ঈমানের মধ্যেই এগুলোর আলোচনা বেশী উপযোগী মনে করেছি এবং সেই হিসাবে এগুলোকে কিতাবুল ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছি। তাই এই খন্ডের অর্ধেক হাদীসই মৃত্যুপরবর্তী বিষয়াবলী অর্থাৎ বরযখ, কবর, কেয়ামত, আখেরাত এবং সেখানে সংঘটিত ঘটনাবলী যেমন হিসাব-কিতাব ও জান্নাত-জাহান্নামের সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলো ঐসব হাদীস, যার দ্বারা শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এর বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা জানা যাবে।

এ কিতাবে উল্লেখিত হাদীসসমূহ অধিকাংশই মেশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কেবল শুরুর দিকে ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কয়েকটি হাদীস এমন রয়েছে, যেগুলো মেশকাত থেকে নেয়া হয়নি; বরং সরাসরি ঐসব কিতাব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেখান থেকে মেশকাতের হাদীস সংকলন করা হয়েছে। তাই এ কিতাবের কোন হাদীস যদি মেশকাতে পাওয়া না যায় অথবা মেশকাতে উল্লেখিত এবং এই কিতাবে উল্লেখিত হাদীসের শব্দমালায় যদি কোন পার্থক্য দেখা যায়, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, এই হাদীসটি সরাসরি মূল কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে।

পাঠকদের সুবিধার জন্য হাদীসগুলোকে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলোর অধিকাংশ শিরোনাম হাদীসের মর্ম ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পাঠকদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। কিতাবটি যেহেতু সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য লিখা হয়েছে, তাই হাদীসসমূহের বিন্যাস ও ক্রমবর্ণনায় রেওয়ায়তের স্তর ও বিশুদ্ধতার স্তরের দিকে লক্ষ্য না করে এ দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্ম উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এই বিন্যাসই যেন পাঠকদের জন্য সহায়ক হয়ে যায়। তদুপরি কোন হাদীসগ্রন্থ অধ্যয়ন করার সময় সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কিতাবটির সংকলক যে ক্রমধারায় হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, এটা সংকলকের নিজের মত ও রুচিবোধের ব্যাপার। অন্যথায় প্রতিটি হাদীসই স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি উপদেশ ও শিক্ষা। এ বিষয়টিও সম্ভব যে, কোন হাদীসগ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় এবং একই শিরোনামে আনীত দু'টি হাদীসের মধ্যে একটি নুবুওয়তের সূচনালগ্নের হবে, আর দ্বিতীয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনের হবে।

হাদীস অধ্যয়নকারীদের আরেকটি বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অধিকাংশ হাদীসই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসী বক্তব্য ও উপদেশ বিশেষ। অথবা তাঁর সামনে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর অথবা কোন সাময়িক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত দিক-নির্দেশনা ও

সতর্কবাণী। তাই ঐ ক্ষেত্র, পরিবেশ এবং শ্রোতাদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে এগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনায় না রেখে সাধারণ লিখকদের রচিত বইপত্রের মত যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। আর এই সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখলে ইনশাআল্লাহ্ কোন জটিলতা ও প্রশ্নের সৃষ্টি হবে না।

যেহেতু এই সংকলনটির আসল উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভান্ডারে সংরক্ষিত শিক্ষা ও হেদায়াতকে এই যুগের সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের জন্য নবীর অনুসরণের পথ সহজ করে দেওয়া, তাই হাদীসের অনুবাদ বাক্যবিন্যাস ও শাব্দিক তরজমার অনুসরণ করাকে জরুরী মনে করা হয়নি; বরং হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্মকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ জন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভাষাও যথাসম্ভব সহজ ব্যবহার করা হয়েছে।

যেসব হাদীসের ব্যাপারে কোন মহলে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে অথবা কোন কোন ভ্রান্তবিশ্বাসী লোক এসব হাদীসের দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে থাকে, এগুলোর ব্যাখ্যার বেলায় এ ধরনের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, কোন কোন হাদীসে কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার উপর জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রত্যেক কালেমা পাঠকারীর উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন কোন হাদীসে এমন ব্যক্তিকে কাফের বলতে নিষেধ করা হয়েছে, যে মুসলমানদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশ্ত খায় ও তাদের কেবলার অনুসরণ করে। আবার এর বিপরীত কোন কোন হাদীসে কোন কোন গুনাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা এতে লিপ্ত হয় তারা মুসলমানই থাকে না এবং ঈমানের মধ্যে তার কোন অংশই নেই। মোটকথা, এ ধরনের জটিল ও ব্যাখ্যাযোগ্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলার তওফীক ও তাঁর বিশেষ সাহায্যে এমনভাবে করা হয়েছে যে, এটা অধ্যয়ন করার পর ইনশাআল্লাহ্ কোন বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না। তবে কারো ভাগ্যে যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত ও সুমতি নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

হাদীস নং ১ থেকে ৭০ পর্যন্ত কোন শিরোনামের অধীন মূল হাদীসের পূর্বে কোন সূচনা বক্তব্য লেখা হয়নি এবং এর প্রয়োজনও মনে করা হয়নি। কিন্তু পরের যে হাদীসগুলো বরযখ জগত, কবরের আযাব এবং কেয়ামত ও আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, এগুলো বুঝানোর জন্য মূল হাদীসের পূর্বে যেখানে যেখানে ভূমিকা ও ব্যাখ্যামূলক নোট লেখার প্রয়োজন মনে করেছি, সেখানে এই ধরনের নোট লিখে দিয়ে পাঠকদের চিন্তাকে পরিষ্কার ও দ্বিধামুক্ত করার চেষ্টা করেছি। বস্তুতঃ বরযখ, কেয়ামত, পুলছিরাত, মীযান, হাউযে কাউছার, শাফাআত, জান্নাত, জাহান্নাম এবং দীদারে এলাহী ইত্যাদি বিষয়াবলী সম্পর্কে যে বিস্তারিত ভূমিকামূলক নোট লিখে দিয়েছি, আশা করা যায়, পাঠকদের জন্য এটা চিত্তের প্রশান্তি ও ঈমান বৃদ্ধির কারণ হবে ইনশাআল্লাহ্।

শেষ নিবেদন

সম্মানিত ও ভাগ্যবান পাঠকদের খেদমতে আমার নিবেদন এই যে, হাদীসের অধ্যয়ন যেন কেবল জ্ঞান চর্চা হিসাবে না করা হয়; বরং এটা করতে হবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের ঈমানী সম্পর্ক তাজা করার উদ্দেশ্যে এবং আমল ও হেদায়াত লাভের নিয়্যতে। তাছাড়া হাদীস অধ্যয়নের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও ভালবাসাকে অন্তরে অবশ্যই জাগ্রত রাখতে হবে। হাদীস এভাবে পড়তে হবে এবং অন্যকে শুনাতে হবে যে, আমরা যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে উপস্থিত, তিনি হাদীস বলছেন, আর আমরা শুনে যাচ্ছি। এমন যদি করা হয়, তাহলে হাদীসের নূর ও হেদায়াত ইনশাআল্লাহ্ নগদে লাভ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই তওফীক দান করুন।

সকলের দো'আ প্রার্থী অধম ও গুনাহগার বান্দা
মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী
২২শে জুমাদাল উখরা ১৩৭৩ হিজরী
মোতাবেক ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ ইং

সূচী-পত্র



কিতাবুল ঈমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدٰى وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّهٗ لاَ يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

কেবল ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য যা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَءَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ * (رواه البخارى ومسلم)

১। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের সকল কর্মকাণ্ড নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়্যত অনুসারেই ফলাফল লাভ করে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করে (আল্লাহ্ এবং রাসূলের সন্তুষ্টি বিধান ছাড়া এর পেছনে অন্য কোন কার্যকারণ থাকে না) তার হিজরত যথার্থই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকেই হয়। (নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি হিজরতকারী হিসাবে পরিগণিত হয় এবং এ হিজরতের নির্ধারিত পুণ্য ও বিনিময় সে লাভ করবে।) অপর দিকে যে ব্যক্তি পার্থিব কোন

স্বার্থসিদ্ধি অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করে, (তার এ হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে পরিগণিত হবে না; বরং) সে বাস্তবে যে উদ্দেশ্যে হিজরত করল, আল্লাহ্র নিকট তার এ হিজরত সে উদ্দেশ্যেই ধরা হবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরে হাদীসটির যে অনুবাদ করা হয়েছে, এতেই এর মর্ম উদ্ধার হয়ে যায় এবং ভাবার্থ প্রকাশের জন্য এর চাইতে অধিক কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু হাদীসটির বিশেষ গুরুত্বের দাবী এই যে, এর অর্থ ও তাৎপর্যের উপর আরো কিছু লিখা হোক।

হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, উম্মতের উপর এই বাস্তব ও সত্য কথাটি তুলে ধরা যে, মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের শুদ্ধাশুদ্ধ এবং এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, পুণ্য কাজ বলে কেবল সেটাকেই ধরা হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সে কাজেরই মূল্যায়ন হবে, যা ভাল নিয়্যতে করা হবে। আর যে পুণ্য কাজ কোন হীন উদ্দেশ্যে ও খারাপ নিয়্যতে করা হবে, সেটা পুণ্য কাজ বলে গণ্য হবে না এবং আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্যও হবে না; বরং নিয়্যত অনুসারে সেটা অশুদ্ধ ও প্রত্যাখ্যাত হবে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও সেটা পুণ্য কাজই মনে হয়।

সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাজের সাথে নিয়্যতও দেখেন এবং বাহ্যিক অবস্থার সাথে অন্তরের অবস্থারও খবর রাখেন। তাই তাঁর দরবারে প্রত্যেক কাজের মূল্যায়ন আমলকারীর নিয়্যত অনুসারে করা হয়।

একটি ভ্রান্তির নিরসন

এখানে কেউ যেন এই ভুল ধারণা না করে যে, কাজের ফলাফল যেহেতু নিয়্যত অনুসারেই হয়ে থাকে, তাহলে কোন মন্দ কাজও ভাল নিয়্যতে করলে সেটা পুণ্য কাজ বলে গণ্য হয়ে যাবে এবং এর জন্য সওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন, কেউ যদি এই নিয়্যতে চুরি অথবা ডাকাতি করে যে, এর দ্বারা অর্জিত সম্পদ গরীব-মিসকীনের সাহায্যে ব্যয় করবে, তাহলে সে সওয়াবের অধিকারী হতে পারবে।

আসল কথা এই যে, যে কাজটি আদতেই মন্দ এবং যে কাজ করতে আল্লাহ্ ও রাসূল নিষেধ করেছেন, এমন কাজে ভাল নিয়্যতের প্রশ্নই আসতে পারে না। এগুলো সর্বাবস্থায়ই মন্দ এবং আল্লাহ্র ক্রোধ ডেকে আনে; বরং এমন খারাপ কাজে ভাল নিয়্যত করা এবং সওয়াবের আশা করা অধিক শাস্তির কারণ হতে পারে। কেননা, এটা আল্লাহ্র দ্বীন ও আহকামের সাথে এক ধরনের উপহাসের শামিল।

এখানে হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নেক আমল সম্পর্কে এ কথাটি বলে দেওয়া যে, নেক কাজও যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে সেটা আর নেক আমল থাকবে না; বরং অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে তার ফল মন্দই হবে। যেমন, যে ব্যক্তি নামায খুব একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে আদায় করে, যাকে আমরা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের নেক আমল মনে করি, সেখানে লোকটি যদি একাগ্রতা ও বিনয়ভাব এই জন্য অবলম্বন করে যে, মানুষ এর দ্বারা তার দ্বীনদারী ও খোদাভীতি সম্পর্কে ভাল মানোভাব পোষণ করবে ও তার সম্মান করবে, তাহলে এই হাদীসের দৃষ্টিতে তার এ বিনয়ভরা ও একাগ্রতার নামাযেরও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন মূল্য নেই। অথবা এক ব্যক্তি কুফ্রের দেশ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করে যায় এবং হিজরতের সকল কষ্ট-মুসীবত বরণ করে নেয়; কিন্তু এই হিজরতের দ্বারা তার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ

অর্জন নয়; বরং এর মধ্যে পার্থিব কোন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। যেমন, হিজরতের দেশে বসবাসকারী কোন মহিলাকে বিয়ে করার খাহেশ তাকে হিজরতে উদ্বুদ্ধ করল। এমতাবস্থায় এই হিজরত ইসলামের জন্য হিজরত হবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সে কোন প্রতিদানও পাবে না; বরং উল্টো সে গুনাহের ভাগী হবে। এটাই হচ্ছে এই হাদীসের মর্ম।

বিরাট নেক আমলও এখলাছশূন্য হলে উহা জাহান্নামেই নিয়ে যাবে

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র আদালত থেকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার ফায়সালা দেওয়া হবে। সবার আগে ঐ ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছিল। সে যখন আদালতে হাজির হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে তাকে নিজের নে'আমতরাশির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও এগুলো স্মরণ করে স্বীকার করবে। তারপর তাকে বলা হবে, বল তো! তুমি এগুলোর কি হক আদায় করেছ এবং কি কাজ করে এসেছ ? সে বলবে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার পথে জেহাদ করেছি এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো কেবল এই উদ্দেশ্যে জেহাদ করেছিলে যে, বীর বাহাদুর হিসাবে প্রসিদ্ধ হবে। আর দুনিয়াতে তো তোমার বীরত্বের আলোচনা হয়েই গিয়েছে। এরপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অনুরূপভাবে একজন দ্বীনের আলেম ও কুরআনের আলেমকে আদালতে হাজির করা হবে। তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি কি আমল করে এসেছ ? সে বলবে ঃ আমি তোমার দ্বীন ও তোমার কুরআনের জ্ঞান লাভ করেছিলাম এবং তা অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছিলাম। আর এসব তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি তো নিজেকে আলেম ও কারী হিসাবে প্রকাশ করার জন্য ওসব করেছিলে। তারপর আল্লাহ্র নির্দেশে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর আরেক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। তাকেও জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি করে এসেছ ? সে বলবে, হে আল্লাহ্! আমি পুণ্য অর্জনের কোন ক্ষেত্রই অবশিষ্ট রাখিনি; বরং সকল খাতে তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি অর্থ ব্যয় করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি তো কেবল এই উদ্দেশ্যে তোমার সম্পদ ব্যয় করেছিলে যে, দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বড় দানশীল বলবে। আর দুনিয়াতে তো তোমার দানশীলতার খুব সুনাম হয়েই গিয়েছে। তারপর তাকেও উপুড় করে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। —মুসলিম

মোটকথা, আল্লাহ্র নিকট কেবল ঐ আমলই কাজে আসবে, যা বিশুদ্ধ নিয়্যতে অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করা হয়। দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় একেই এখলাছ বলা হয়।

কুরআন মজীদে মুখলেছ ও অমুখলেছের আমলের একটি দৃষ্টান্ত

পবিত্র কুরআনের নিম্নের দু'টি আয়াতে দান-খয়রাতকারী দুই শ্রেণীর মানুষের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে ঐসব লোক, যারা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদ কল্যাণখাতে ব্যয় করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে ঐসকল মানুষ, যারা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ দ্বারা গরীব, মিসকীন ও অভাবীদের সাহায্য

করে। এ দুই শ্রেণীর মানুষের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডকে দেখতে সম্পূর্ণ একই মনে হয়। মানুষের চোখ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে যে, যেহেতু তাদের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য ভিন্ন, তাই তাদের আমলের ফলাফলও ভিন্ন হবে। এক শ্রেণীর মানুষের আমল বরকত ও কল্যাণে পরিপূর্ণ, আর অপর শ্রেণীর মানুষের আমল সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও বিনষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ط

তোমরা ঐ ব্যক্তির মত নিজেদের দান-খয়রাতকে বিনষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে থাকে, অথচ সে আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন যে, একটি মসৃণ পাথরে কিছু মাটি জমে গেল (এবং এর উপর কিছু সবুজ ঘাস উৎপন্ন হয়ে গেল।) তারপর এর উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল এবং একে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তাই এই ধরনের রিয়াকার লোকেরা নিজেদের উপার্জিত সম্পদের কোন বিনিময় লাভ করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ এই অকৃতজ্ঞদেরকে হেদায়াত ও এর সুমিষ্ট ফল থেকে বঞ্চিতই রাখবেন। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৪)

অপরদিকে মুখলেছদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج

যারা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় ও ত্যাগ-তিতীক্ষায় অভ্যস্ত করার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাহে খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে টিলায় অবস্থিত সজীব বাগানের মত, যাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এর ফলে দ্বিগুণ ফল দান করে। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৫)

এখানে যদিও উভয় ব্যক্তি বাহ্যত একইভাবে নিজেদের ধন-সম্পদ গরীব, মিসকীন ও অভাবীদের জন্য ব্যয় করেছে; কিন্তু একজনের নিয়্যত যেহেতু কেবল লোকদেখানোই ছিল, তাই মানুষের সামনে তার এই প্রদর্শনী সাময়িক বাহবা কুড়ানো ছাড়া আর কিছুই লাভ হল না। কেননা, তার এই অর্থব্যয়ের পেছনে এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি যেহেতু এ অর্থ ব্যয় ও ত্যাগ দ্বারা কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ ও তাঁর অনুগ্রহ কামনা করেছিল, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার নিয়্যত অনুযায়ী ফল দান করেছেন।

সারকথা, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র নীতি ও তাঁর বিধান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ কথাটিরই ঘোষণা দিয়েছেন।

দুনিয়াতে বাহ্যিক অবস্থার উপর সকল ফায়সালা হয়ে থাকে,
আখেরাতে নিয়্যতের উপর ফায়সালা হবে

এই জগতে যেখানে আমরা বর্তমানে রয়েছি এবং যেখানে আমাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিয়ে রাখা হয়েছে, এটাকে "আলমে যাহের" তথা দৃশ্য ও প্রকাশ্য জগত বলা হয়। এখানে

আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং সকল বোধ-বুদ্ধির সীমানা ও বাহ্যিক অবস্থা ও বিষয়াবলী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এখানে আমরা কোন ব্যক্তির কোন বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখেই তার ব্যাপারে ভাল অথবা মন্দ কোন মন্তব্য করতে পারি এবং এরই ভিত্তিতে তার সাথে আমরা নিজেরাও আচরণ করে থাকি। বাহ্যিক কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণের বাইরে তাদের নিয়্যত, অন্তরের রহস্য ও মনের গোপন অবস্থা উপলব্ধি করতে আমরা অক্ষম। এই জন্যই ফারুকে আযম হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ আমাদের কাজ হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করা, আর গোপন অবস্থা আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেওয়া।

কিন্তু আখেরাতের জগতে বিচারক হবেন আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি সকল গোপন বিষয় সম্যক অবগত। তাই সেখানে মানুষের নিয়্যত ও মনের ইচ্ছা বিবেচনায় সকল বিচার ও সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। অতএব, মনে রাখতে হবে যে, এই জগতে বিধান প্রয়োগের বেলায় যেমন বাহ্যিক আমল ও কর্মই মূল বিষয় এবং কারো নিয়্যতের উপর এখানে বিচার করা যায় না, অনুরূপভাবে আখেরাতে বিষয়টি হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বিচার ও ফায়সালা করবেন নিয়্যত দেখে; সেখানে বাহ্যিক আমল ও কর্মকে কেবল নিয়্যতের অনুগামী হিসাবে গণ্য করা হবে।

হাদীসটির বিশেষ গুরুত্ব

এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত তত্ত্বপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। দ্বীনের একটা বিরাট অংশ এই হাদীস নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। তাই এটাকে 'ক্ষুদ্র ঝিনুকের ভিতরে মহাসমুদ্র' বলা যায়। এই জন্যই কোন কোন ইমাম বলেছেন, ইসলামের এক তৃতীয়াংশ এই হাদীসে এসে গিয়েছে। আর বাস্তবতার নিরিখে বলতে গেলে মহান ইমামদের এই কথায় কোন অতিরঞ্জন নেই; বরং তাদের কথাই যথার্থ। কেননা, মৌলিক দিক থেকে ইসলামের বিভাগ তিনটি ঃ (১) ঈমান তথা আকীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী, (২) আমল ও (৩) এখলাছ। যেহেতু এই হাদীস এখলাছের সম্পূর্ণ বিভাগকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, তাই বলা যায় যে, ইসলামের এক তৃতীয়াংশই এখানে এসে গিয়েছে।

এখলাস এমন বস্তু যে, প্রত্যেক কাজে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে এর প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশেষ করে আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যখন কোন শুভ কাজের সূচনা করে, সে কাজটি আমল সংক্রান্তই হোক অথবা গবেষণাধর্মীই হোক, সেখানে সে প্রয়োজন অনুভব করে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটি চোখের সামনে থাকুক। এই জন্যই অনেক মনীষীকেই দেখা যায় যে, তাঁরা নিজেদের গ্রন্থসমূহ এই হাদীস দ্বারা শুরু করা খুবই পছন্দ করেছেন। যেমন, ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর অমরগ্রন্থ বুখারী শরীফকে এই হাদীস দ্বারাই শুরু করেছেন। তাঁর পরে ইমাম বগভী (রহঃ) তাঁর মাসাবীহ নামক হাদীসগ্রন্থকেও এই হাদীস দ্বারা শুরু করেছেন। তাঁরা যেন এই হাদীসটিকে কিতাবের 'প্রারম্ভিকা' বানিয়ে নিয়েছেন। হাফেযুল হাদীস আব্দুর রহমান ইবনে মাহ্দী (রহঃ) বলেন, কেউ কোন দ্বীনি কিতাব লিখতে চাইলে এই হাদীস দ্বারাই সেই কিতাবের সূচনা হোক, এটাই আমি উত্তম মনে করি। আমি নিজে কোন কিতাব লিখলে এর প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনা এই হাদীস দ্বারাই করব। —ফতহুল বারী

অধম লিখক নিবেদন করছে যে, এই জন্যই আমি আমার সংকলনটিও এই হাদীস দ্বারাই শুরু করলাম। আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দরভাবে তা সমাপ্ত করার তওফীক দান করুন এবং কবূল করে নিন। এর সাথে আমাকে এবং কিতাবের সকল পাঠককে পরিপূর্ণ এখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়্যত নসীব করুন। আমীন

(এখন থেকে এক বিশেষ তরতীব ও বিন্যাসে এখানে ঐসব হাদীস লিপিবদ্ধ করা হবে, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান ও ইসলামের অথবা এগুলোর ভিত্তি ও শাখা-প্রশাখাসমূহের অথবা ঈমান ও ইসলামের অপরিহার্য পরিপূরক বিষয়সমূহের অথবা এগুলোর কল্যাণ ও ফলশ্রুতির অথবা এগুলোর ক্ষতিকারক ও সাংঘর্ষিক বিষয়সমূহের আলোচনা করেছেন। এই পর্যায়ে সর্বপ্রথম হাদীসে জিবরাঈল লিখা হচ্ছে যার মধ্যে মৌলিকভাবে দ্বীনের সকল বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এই কারণেই হাদীসটি উম্মুস্ সুন্নাহ তথা হাদীসের মূল নামে পরিচিত।)

ইসলাম, ঈমান ও এহ্সানের পরিচয়

(٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً، قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهٗ يَسْأَلُهٗ وَيُصَدِّقُهٗ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ، قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهٗ جِبْرَئِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ – (رواه مسلم)

২। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। (এই হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ঐ সময় পবিত্র মজলিসে অনেক সাহাবায়ে কেরাম সমবেত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন।) এমন সময় হঠাৎ এক

ব্যক্তি সামনে আসল, যার পোশাক ছিল খুবই শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন আর চুলগুলোও ছিল ঘন কালো। তার মধ্যে সফরের কোন লক্ষণ বুঝা যাচ্ছিল না, (যাতে মনে হচ্ছিল যে, এ ব্যক্তি বহিরাগত কেউ নয়।) কিন্তু এরই সাথে আরেকটি ব্যাপার ইহাও ছিল যে, আমাদের কেউই তাকে চিনতে পারছিল না, (যাতে ধারণা হচ্ছিল যে, এ কোন বহিরাগত লোকই হবে, এরই মধ্যে লোকটি উপস্থিত জনতার বৃত্তকে অতিক্রম করে সামনে আসল।) এভাবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে নিজের হাঁটুদ্বয়কে তাঁর হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে বসে গেল এবং নিজের হাত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রানের উপর রেখে দিল। তারপর বলল, হে মুহাম্মদ! আমাকে বলুন, ইসলাম কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ইসলাম হল, (অর্থাৎ, ইসলামের মূল ভিত্তি হল,) তুমি (মুখে ও অন্তরে) এই কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ (অর্থাৎ, বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত কোন সত্তা) নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল, আর নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে। নবাগত লোকটি এই উত্তর শুনে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ওমর (রাঃ) বলেন, আমাদের আশ্চর্য লাগল যে, লোকটি প্রশ্নও করে আবার নিজেই সত্যায়ন করে। তারপর সে আরয করল, এখন আমাকে বলুন, ঈমান কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর নবী-রাসূলদের প্রতি, শেষ দিবস অর্থাৎ কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, (অর্থাৎ, এগুলোকে সত্য বলে জানবে ও মানবে।) আর প্রত্যেক ভাল-মন্দ বিষয়কে তকদীরের লিখন বলে মেনে নেবে। (এই উত্তর শুনেও) আগন্তুক লোকটি বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি আবার বলল, এহসান কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এহসান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর এবাদত ও বন্দেগী এভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। তারপর লোকটি আবার বলল, আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন (যে, এটা কবে হবে) তিনি উত্তরে বললেন ঃ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী জানে না। তারপর ঐ আগন্তুক বলল, তাহলে আমাকে এর কিছু লক্ষণাদিই বলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরে বললেন ঃ (এর একটি লক্ষণ এই যে,) দাসী তার কর্তী ও মনিবকে জন্ম দেবে। (আর দ্বিতীয় লক্ষণটি এই যে,) তুমি দেখবে যে, যাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় নেই এবং যারা নিঃস্ব ও ছাগল চরিয়ে খায়, তারাই বিরাট বিরাট অট্টালিকা তৈরী করবে এবং তা নিয়ে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এসব কথাবার্তা বলে আগন্তুক লোকটি চলে গেল। এভাবে বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে ওমর! তুমি বলতে পার, প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিল ? আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিব্‌রাঈল। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এই মজলিসে এসেছিলেন। ---মুসলিম

বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে একজন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন ঃ (১) ইসলাম, (২) ঈমান, (৩) এহসান, (৪) কেয়ামতের ব্যাপারে এই তথ্য যে, এটা সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ

জানেন না এবং (৫) কেয়ামতের পূর্বে প্রকাশিত এর কিছু লক্ষণ ও আলামত। এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে যা কিছু এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলোই ব্যাখ্যার দাবী রাখে। তাই প্রথমেই আসা যাক ইসলাম প্রসঙ্গে।

(১) **ইসলাম** ঃ ইসলামের আসল অর্থ হচ্ছে নিজেকে কারো কাছে সমর্পণ করে দেওয়া এবং সম্পূর্ণ তারই নির্দেশের অধীন হয়ে যাওয়া। আর মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত ও তাঁর রাসূলগণ কর্তৃক আনীত দ্বীনের নাম 'ইসলাম' এজন্যই রাখা হয়েছে যে, এখানে বান্দা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে দেয় এবং তাঁর সার্বিক আনুগত্যকে নিজের জীবন সাধনার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নেয়। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে ইসলামের হাকীকত ও তাৎপর্য এবং আমাদের কাছে এরই দাবী করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের আল্লাহ্ তো একক আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা মুসলিম অর্থাৎ তাঁরই আজ্ঞাধীন হয়ে যাও। (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৩৪)

এই ইসলাম সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ তার চেয়ে উত্তম মানুষ আর কে হতে পারে, যে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে এবং সে এভাবে মুসলিম বান্দা হয়ে গিয়েছে। (সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২৫)

এই ইসলাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অবলম্বন করতে চায়, তার পক্ষ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৮৫)

মোটকথা, ইসলামের মূল প্রাণশক্তি ও এর হাকীকত এটাই যে, বান্দা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে দেবে এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁরই আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে।

নবী-রাসূলদের আনীত শরীঅতসমূহে এই ইসলামের জন্য বিশেষ কিছু মৌলিক বিধি-বিধানও থাকে, যেগুলোর অবস্থান এই মূল ইসলামের অবয়ব তুল্য। আর এই মূলের ক্রমবৃদ্ধি ও এর সজীবতা এ সকল বিধি-বিধানের দ্বারাই হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অনুসৃত বিষয় হয়ে থাকে এবং এই বিষয়গুলো দ্বারাই বাহ্যত তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, যারা ইসলামকে নিজেদের জীবনবিধান বানিয়ে নিয়েছে আর যারা তা করেনি।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ইসলামের যে সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ জীবনবিধান আমাদের কাছে এসেছে, এর মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্বতার বিশ্বাস, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান, নামায, যাকাত, রোযা ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জকে ইসলামের স্তম্ভ ও মৌলিক বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্য এক হাদীসেও বলা হয়েছে ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর স্থাপিত।

যা হোক, ইসলামের পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে এই হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাঁচটি জিনিসকে উল্লেখ করেছেন, এগুলোই হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদ। আর এগুলোই মূল ইসলামের দৃষ্ট অবয়ব। এই জন্যই ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে এই বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) **ঈমান** ঃ ঈমানের আসল অর্থ হচ্ছে কারো নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে তার কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় ঈমানের মূলতত্ত্ব হচ্ছে এই যে, আল্লাহর রাসূল আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বোধশক্তির উর্ধ্বের যেসকল বিষয়ের কথা বলেন এবং

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁরা যে হেদায়াত ও জ্ঞান নিয়ে আসেন, সেগুলোকে সত্য ও বাস্তব মনে করে বিশ্বাস করে নেওয়া এবং মেনে নেওয়া। যা হোক, পারিভাষিক ঈমানের সম্পর্ক মূলতঃ অদৃশ্য বিষয়াবলীর সাথেই থাকে, যেগুলো আমরা নিজেদের অনুভূতিযন্ত্র ও বোধশক্তি যেমন নাক, কান ইত্যাদি দ্বারা বুঝতে পারি না। যেমন, মহান আল্লাহ্, তাঁর গুণাবলী, তাঁর বিধি-বিধান, নবী-রাসূলদের রেসালত এবং তাঁদের প্রতি ওহী অবতরণ, সৃষ্টির সূচনা ও পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের বর্ণনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের যে সকল বিষয় আল্লাহ্র রাসূল বর্ণনা করেন এগুলোকে তাঁর বিশ্বস্ততার ভরসায় সত্য মনে করে মেনে নেওয়ার নামই শরীঅতের পরিভাষায় ঈমান। আর রাসূলের বর্ণিত এ ধরনের যে কোন বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস না করাই হচ্ছে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, যা মানুষকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দিয়ে কুফরের সীমানায় পৌঁছে দেয়। তাই একজন মানুষের মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহ্র রাসূল কর্তৃক আনীত সকল বিষয় ও তথ্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া জরুরী। তবে এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা জরুরী নয়; বরং মূল ঈমানের জন্য সংক্ষিপ্ত ও সার বিশ্বাসই যথেষ্ট।

তবে কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় এমনও রয়েছে যে, ঈমানের সীমানায় প্রবেশ করার জন্য এগুলোর প্রতি নিরুপণসহ বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। যেমন, আলোচ্য হাদীসে ঈমান প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, (অর্থাৎ, আল্লাহ্, ফেরেশতা, আল্লাহ্র কিতাব, আল্লাহ্র রাসূল, কেয়ামত ও তকদীরের ভাল-মন্দ) ঈমান সংক্রান্ত বিষয়সমূহের মধ্যে এগুলোই হচ্ছে মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়। আর এগুলোর উপর নির্দিষ্টভাবে ও নিরুপণ করে ঈমান পোষণ করা জরুরী। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে এবং নির্দিষ্ট করে এগুলোর উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনেও ঈমান সংক্রান্ত এই বিষয়গুলি এই ক্রমধারায় ও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারার শেষ রুকূতে এরশাদ হয়েছে ঃ রাসূল ঈমান রাখেন ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সকল মু'মিনগণও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। সূরা নিসায় এরশাদ হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।

উপরে উল্লেখিত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে 'তকদীরের প্রতি ঈমান' প্রসঙ্গটি যদিও কুরআনে অন্যান্য ঈমানী বিষয়সমূহের সাথে একই সঙ্গে আলোচিত হয়নি; কিন্তু পবিত্র কুরআনেই অন্যান্য স্থানে এর সুষ্ঠু উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, সূরা নিসায় এরশাদ হয়েছে ঃ "হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, সব কিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তাঁরই নির্দেশে হয়। সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তিনি তার বক্ষ উন্মোচন করে দেন। আর যাকে গোমরাহ রাখার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন।"

এবার সংক্ষেপে জেনে নিতে হবে যে, এ বিষয়গুলোর উপর ঈমান আনার অর্থ কি? বস্তুতঃ আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনি বর্তমান, তিনি একক ও

শরীকবিহীন, তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি সকল দোষ ও দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এবং তিনিই সকল গুণের আধার।

ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁদেরকে একটি বিশেষ শ্রেণী হিসাবে তাঁদের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, তাঁরা এক পবিত্র ও সম্মানিত সৃষ্টি। কুরআন পাকে সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ "তারা হচ্ছে সম্মানিত বান্দা।" এই ফেরেশতাদের মধ্যে কোন মন্দ দিক, কোন প্রকার দুষ্টামি ও অবাধ্যতার উপাদানই নেই; বরং তাদের কাজই হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য ও নির্দেশ পালন। সূরা তাহ্রীমে এরশাদ হয়েছে ঃ "তারা আল্লাহ্র নির্দেশের অবাধ্যতা করে না; বরং তারা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যায়।" তাদের দায়িত্বে অনেক কাজ ও দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, যেগুলো তারা সুন্দরভাবে সম্পাদন করে থাকে।

ফেরেশ্তাদের ব্যাপারে একটি সংশয় ও এর উত্তর

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই সংশয় উত্থাপন করা হয় যে, তাঁরা বর্তমান থাকলে তো আমরা অবশ্যই দেখতে পেতাম, এটা অত্যন্ত মূর্খতাপ্রসূত সংশয়। কেননা, দুনিয়াতে এমন অনেক বস্তু রয়েছে, যেগুলো বর্তমান ও অস্তিত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই না। বর্তমান যুগের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে কি কেউ পানিতে, বাতাসে এবং রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে ঐসব জীবাণু দেখেছিল, যেগুলো আজ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সবাই দেখতে পারে? আমরা কি কোন যন্ত্রের সাহায্যেও নিজেদের আত্মাকে দেখতে পাই? তাই যেমনভাবে আমাদের চোখ আমাদের আত্মাকে দেখতে অপারগ এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া পানি ইত্যাদির মধ্যে লুক্কায়িত রোগ-জীবানু দেখতে অক্ষম, ঠিক সেভাবেই এগুলো ফেরেশতাকুলকে দেখতেও অপারগ। তারপর একথার কি প্রমাণ আছে যে, আমরা চোখে যে জিনিস দেখি না, সেটার অস্তিত্বই নেই? আমাদের চোখ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি কি অস্তিত্বজগতের সব কিছুকে ধারণ করতে পারে? এসব কথা— বিশেষ করে যখন নব নব আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচিত হতে চলেছে— কেবল চরম নির্বোধ ব্যক্তিই বলতে পারে।

আসলে মানুষের জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের উপকরণ ও উপাদানসমূহ খুবই দুর্বল ও সীমিত। এ কথাটিই কুরআন পাকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদেরকে কেবল সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

আল্লাহ্র কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার অর্থ এই যে, একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য বিভিন্ন সময়ে পথ নির্দেশিকা তথা আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ও সমাপক গ্রন্থ হচ্ছে কুরআন শরীফ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী ও সারনির্যাসও। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এমন সেসব বিষয় ছিল, যেগুলোর শিক্ষা ও প্রচারের প্রয়োজন সর্বকালেই থাকবে, সেসব বিষয়সমূহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত রয়েছে। তাই বলা যায় যে, এই কুরআন সকল আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে পরিবেষ্টন করে সকল কিতাবের প্রয়োজন থেকে মানবজাতিকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ যেহেতু বর্তমানে সংরক্ষিত নয়; তাই এটাই একমাত্র সুপথের দিশারী মহাগ্রন্থ। এই কিতাবই সব কিতাবের স্থলাভিষিক্ত এবং সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত এটা

সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "কুরআন আমিই নাযিল করেছি, আর আমিই এর সংরক্ষণকারী।" (সূরা হিজর)

আল্লাহ্র রাসূলদের উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, এই বাস্তব সত্যকে বিশ্বাস করে নেওয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর নির্বাচিত বান্দাদেরকে হেদায়াত ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নীতিমালা দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্র পয়গাম বান্দাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা মানবজাতিকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করে গিয়েছেন। এ সকল নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র নির্বাচিত প্রিয়জন ও সত্যের প্রতীক ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে কিছু কিছু নবী-রাসূলের নাম ও তাঁদের কিছু অবস্থাও কুরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "আমি আপনার পূর্বে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি। তাদের কারো কারো অবস্থা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো অবস্থা বিবৃত করিনি।" (সূরা মু'মিন)

আল্লাহ্ তা'আলার এইসব নবী-রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া এবং নবী হিসাবে তাদের সম্মান ও ভক্তি করা ঈমানের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে সাথে এ বিষয়ের উপরও ঈমান আনা জরুরী যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই নবুওয়াত ও রেসালতের ক্রমধারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পরিসমাপ্ত করে দিয়েছেন। তাই তিনিই খাতামুল আম্বিয়া ও আল্লাহ্র শেষ রাসূল। তাঁর যুগ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানব সমাজের মুক্তি ও সফলতা কেবল তাঁরই আনুগত্য ও তাঁরই আনীত হেদায়াতের অনুসরণের মধ্যে নিহিত।

আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে এই বাস্তব ও সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া যে, এই দুনিয়াকে একদিন অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরতে সকল মৃত প্রাণীকে পুনরায় জীবন দান করবেন এবং এখানে যে যেমন কর্ম করেছে, সে অনুযায়ী তাদেরকে সেখানে শান্তি অথবা শাস্তি দেওয়া হবে।

জানা আবশ্যক যে, দ্বীন-ধর্মের সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি এই বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, আখেরাতে মানুষের বিচার তথা শান্তি অথবা শাস্তি হবে। মানুষ যদি এই বিষয়টি স্বীকার না করে, তাহলে সে কোন ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং এর পথনির্দেশনা মানতে ও এগুলো পালন করতেই রাজী হবে না। এই জন্যই সকল ধর্মে— তা মানুষের মনগড়া ধর্মই হোক অথবা আল্লাহ্র প্রেরিত দ্বীন হোক— এই শাস্তি ও পুরস্কারকে মৌলিক বিশ্বাস হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তারপর মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত ধর্মগুলোতে এর স্বরূপ "পুনঃ জন্মবাদ" বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্প্রদত্ত সকল ধর্মই এই বিষয়ে একমত যে, আখেরাতের শান্তি ও শাস্তির পদ্ধতি ঐ পুনরুত্থান ও হাশর-নশরই, যা কুরআন আমাদেরকে বলে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে এমন প্রামাণিক ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, চরম পর্যায়ের আহ্মক ও নির্বোধ ছাড়া অন্য কেউ কুরআনের এসব অকাট্য ও যুক্তিযুক্ত আলোচনার পর হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের বিষয়টিকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করতে পারে না।

তকদীরের প্রতি ঈমান এর অর্থ হচ্ছে এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও স্বীকার করে নেওয়া যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে (তা ভালই হোক আর মন্দই হোক,) এ সবই আল্লাহ্র নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছায়ই হচ্ছে। এগুলোর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা তিনি পূর্বেই করে রেখেছেন। এমন নয় যে, তিনি অন্য একটা কিছু চান, আর পৃথিবীর এই কারখানা তাঁর ইচ্ছার বিপরীত

চলছে। এমন মনে করলে আল্লাহ্ তা'আলার চরম অপারগতা ও অক্ষমতা মেনে নিতে হয়, যা ঈমানের পরিপন্থী।

(৩) এহ্সান ঃ ইসলাম ও ঈমানের পর প্রশ্নকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তৃতীয় প্রশ্নটি করেছিল এহ্সান সম্পর্কে যে, এহ্সানের প্রকৃত অর্থ কি ?

এই 'এহ্সান' শব্দটিও ঈমান ও ইসলামের মত একটি বিশেষ ধর্মীয় পরিভাষা। বিশেষতঃ এটা কুরআনের পরিভাষা। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে এবং এর সাথে তার মধ্যে 'এহ্সান' গুণও রয়েছে, তার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য রয়েছে বিশেষ প্রতিদান।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১১২)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ "তার চাইতে উত্তম দ্বীনদার আর কে আছে, যে নিজেকে আল্লাহ্তে সমর্পণ করে দিয়েছে এবং সাথে সাথে তার মধ্যে এহ্সানের গুণও বিদ্যমান।" (সূরা নিসা)

আমাদের ভাষায় ও বাকপদ্ধতিতে তো এহ্সান শব্দের অর্থ কারো সাথে উত্তম ও অনুগ্রহমূলক আচরণ করা, কিন্তু এখানে যে এহ্সানের কথা বলা হচ্ছে সেটা ভিন্নতর এক পরিভাষা। আর এর মর্মও তাই, যা আলোচ্য হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্র বন্দেগী এভাবে করা, যেন মহান প্রতাপশালী ও পবিত্র সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের চোখের সামনেই রয়েছেন এবং আমরাও যেন তাঁকে দেখছি।

এ বিষয়টি এভাবে বুঝে নিতে পারেন যে, একজন গোলাম তার মনিবের হুকুম পালন তখনও করে, যখন মনিব তার চোখের সামনে উপস্থিত থাকে এবং গোলামও বিশ্বাস করে যে, তিনি আমাকে ভালভাবেই দেখছেন। আর তার হুকুম পালনের আরেকটি ধরন তখন হয়, যখন সে মনিবের অনুপস্থিতিতে কাজ করে। এই দুই সময়ের কাজে সাধারণতঃ পার্থক্য হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মালিকের উপস্থিতিতে গোলাম যেরূপ মনোযোগ ও পরিশ্রমের সাথে সুন্দরভাবে কার্য সম্পাদন করে, মালিকের অনুপস্থিতিতে তার অবস্থা সেরূপ থাকে না। ঠিক একই অবস্থা হয়ে থাকে প্রকৃত মনিব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে তাঁর বান্দাদের। বান্দা যখন অনুভব করে যে, আমার মাওলা ও মনিব হাযির-নাযির অর্থাৎ তিনি আমার সামনেই রয়েছেন এবং আমাকে দেখছেন, আমার প্রতিটি কাজ— বরং আমার প্রতিটি গতি ও বিরাম তিনি দেখছেন, তখন তার মধ্যে এক বিশেষ মত্ততা ও তাঁর বন্দেগীতে বিশেষ ধরনের বিনয়ভাব ফুটে উঠে। কিন্তু তার অন্তরে যখন এ কল্পনা ও এ অনুভূতি উপস্থিত থাকে না, তখন তার বন্দেগীর ঐ অবস্থাও আর অবশিষ্ট থাকে না।

তাই এহ্সান এটাই যে, আল্লাহ্র বন্দেগী এভাবে করা হবে যে, তিনি যেন আমাদের চোখের সামনেই রয়েছেন, আর আমরাও তাঁর সামনে উপস্থিত এবং তিনি আমাদেরকে দেখছেন। হাদীসে উল্লেখিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তির মর্ম এটাই, যেখানে তিনি বলেছেন, এহ্সান এরই নাম যে, তুমি আল্লাহ্র বন্দেগী এভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। কেননা, তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়

অনেকে হাদীসের এই অংশটির ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, মনে হয়, এর সম্পর্ক কেবল নামাযের সাথেই এবং এর অর্থ কেবল এই যে, নামায খুব মনোযোগ সহকারে একাগ্রতার সাথে আদায় করতে হবে। কিন্তু হাদীসের শব্দমালার এমন বিশেষত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়

না। হাদীসে 'আল্লাহ্‌র এবাদত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কেবল নামাযের সাথে এটাকে সংশ্লিষ্ট রাখার কোন কারণ নেই; বরং যে কোন এবাদতই এর অন্তর্ভুক্ত; বরং এই হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনায় 'আল্লাহ্‌কে ভয় করবে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এহ্‌সান হচ্ছে আল্লাহ্‌কে এভাবে ভয় করা, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। এই ঘটনারই অন্য আরেক বর্ণনায় এরূপ শব্দমালাও এসেছে, যার অর্থ এই ঃ এহ্‌সান হচ্ছে এই যে, তুমি সকল কাজ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এভাবে সম্পাদন করবে যে, তুমি যেন তাঁকে দেখছ। এই দু'টি বর্ণনার দ্বারা এ কথা আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এহ্‌সানের সম্পর্ক কেবল নামাযের সাথেই নয়; বরং মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের সাথে এটা জড়িত। তাই এহ্‌সানের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌র সকল এবাদত এবং তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালন এভাবে করতে হবে এবং তাঁর শাস্তিকে এভাবে ভয় করতে হবে যে, তিনি যেন আমাদের সামনেই রয়েছেন এবং আমাদের সকল কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছেন।

(৪) কেয়ামত ঃ ইসলাম, ঈমান ও এহ্‌সান সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর আগন্তুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে, আমাকে বলে দিন, কেয়ামত কবে হবে। উত্তরে তিনি বললেন, এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক অবগত নয়। অর্থাৎ, কেয়ামত আসার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে প্রশ্নকারীর যেমন জানা নাই, আমারও জানা নেই। এই হাদীসেরই আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এখানে এ শব্দমালাও এসেছে ঃ

فِىْ خُمْسٍ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ- اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ط

অর্থ ঃ কেয়ামতের বিষয়টি ঐ পাঁচ জিনিসের অন্তর্গত, যেগুলো আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। (যেমন, এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ) নিশ্চয়, কেয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনিই তা জানেন। কেউ জানে না, আগমীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন্ জায়গায় সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীকে প্রথমে বলে দিলেন যে, কেয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চাইতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি বেশী অবগত নয়। তারপর অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে একথাও বলে দিলেন যে, কেয়ামতের বিষয়টি ঐ পাঁচ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এগুলোর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ এগুলো জানেন না।

হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, কেয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "এ বিষয়ে আমি জানি না" না বলে "প্রশ্নকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না" এই বর্ণনাভঙ্গী এজন্য অবলম্বন করেছেন, যাতে মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, কোন প্রশ্নকারী ও কোন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরই এই ব্যাপারে জ্ঞান নেই। তারপর কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে তিনি বিষয়টি আরো পাকাপোক্ত করে দিলেন।

(৫) কেয়ামতের আলামত ঃ কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে উপরোক্ত উত্তর শুনে প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করে বলল ঃ আমাকে কেয়ামতের কিছু নিদর্শনই বলে দিন। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি বিশেষ নিদর্শন বর্ণনা করলেন। একটি নিদর্শন এই যে, দাসী তার মালিক ও মনিবকে জন্ম দেবে, আর দ্বিতীয়টি এই যে, নিঃস্ব ও ভুখা-নাঙ্গা মানুষ— যাদের কাজ হচ্ছে ছাগল চরানো— তারাও বিরাট বিরাট অট্টালিকা তৈরী করবে।

প্রথম যে নিদর্শনটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ এর বিভিন্ন মর্ম উল্লেখ করেছেন। তবে এই অধম সংকলকের কাছে এর সব চাইতে সুন্দর ব্যাখ্যা এই যে, কেয়ামত সন্নিকটে আসার সময় পিতা-মাতার অবাধ্যতা ব্যাপক রূপ ধারণ করবে। এমনকি কন্যাসন্তান যাদের প্রকৃতি ও স্বভাবে মায়েদের আনুগত্য ও হৃদ্যতার উপাদান খুবই প্রবল থাকে এবং যাদের ব্যাপারে মায়েদের অবাধ্যতার কল্পনাও করা যায় না— তারাও কেবল মায়েদের অবাধ্যই হবে না; বরং উল্টো তাদের উপর এভাবে শাসন চালাবে, যেভাবে গৃহকর্তী ও মনিব তার ক্রীতদাসীর উপর শাসন চালায়। এ কথাটিই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বর্ণনাভঙ্গীতে বলেছেন যে, "মহিলা তার মালিক ও মনিবকে জন্ম দেবে।" অর্থাৎ, মায়ের গর্ভ থেকে যে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে-ই বড় হয়ে এই মায়ের উপর শাসন চালাবে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই নিদর্শন প্রকাশের সূচনা হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় যে নিদর্শনটির কথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে, "ভুখা-নাঙ্গা ও রাখাল শ্রেণীর মানুষ সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করবে।" এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত এগিয়ে আসলে দুনিয়ার সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি ঐসব নিম্নশ্রেণীর মানুষের হাতে এসে যাবে, যারা আসলে এর যোগ্য নয়। তখন তারা কেবল সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণের নেশায় পড়ে থাকবে এবং এটাকেই তারা গৌরব ও বাহাদুরীর বিষয় মনে করবে। এতেই তারা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মনের সাধ পূরণ করবে এবং এক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে।

অন্য এক হাদীসে এ বিষয়টিকে এই শব্দমালায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, বিভিন্ন পদ ও কর্মকাণ্ড অযোগ্য লোকদের হাতে ন্যস্ত হবে, তখন তুমি কেয়ামতের অপেক্ষায় থাক।

আলোচ্য হাদীসের শেষে রয়েছে যে, এই প্রশ্নকারী চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই প্রশ্নকারী ছিলেন জিবরাঈল। তিনি প্রশ্নকারীর রূপ ধরে এ জন্য এসেছিলেন, যাতে এ প্রশ্নোত্তর দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় এ কথার উল্লেখও আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর এই আগমন ও কথোপকথনের ঘটনাটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিকে হয়েছিল। —ফতহুল বারী ও উমদাতুল কারী

এর রহস্য এই যে, তেইশ বছরের নবুওতী জিন্দেগীতে যে দ্বীনের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়েছিল; আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় এটা চাইলেন যে, জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান দ্বারা পূর্ণ দ্বীনের সারবস্তু বয়ান করিয়ে দিয়ে

সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হোক এবং তাদেরকে এই দ্বীনের আমানতের সংরক্ষণকারী বানিয়ে দেওয়া হোক।

বাস্তব কথা এই যে, দ্বীনের মূল বিষয় তিনটিই ঃ (১) বান্দা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অনুগত ও হুকুমবরদার বানিয়ে নেবে এবং তাঁর বন্দেগীকেই নিজের জিন্দেগী বানিয়ে নেবে। আর এরই নাম হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের মূল বিধানগুলো হচ্ছে এর দৃষ্ট অবয়ব ও প্রকাশস্থল। (২) ঐ সকল অদৃশ্য বাস্তব বিষয়সমূহকে মেনে নেওয়া এবং এগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ যেগুলোর সংবাদ দিয়েছেন এবং এগুলো স্বীকার করার প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। আর এরই নাম ঈমান। (৩) আল্লাহ্ যদি ভাগ্যে রাখেন তাহলে ইসলাম ও ঈমানের স্তরসমূহ অতিক্রম করার পর তৃতীয় ও চূড়ান্ত মনযিল এই আসে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার উপস্থিতি ও অন্তরে আল্লাহ্র ধ্যানের এমন মত্ততা অনুভব করে যে, তখন তাঁর নির্দেশ পালন ও বন্দেগী এমনভাবে হতে থাকে, যেন আল্লাহ্ তাঁর সকল শোভা ও প্রতাপসহ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে দেখছেন। এ অনুভূতি ও এ অবস্থার নামই হচ্ছে 'এহ্সান'।

এভাবে এই প্রশ্নোত্তরে যেন সম্পূর্ণ দ্বীনের সারবস্তু এসে গিয়েছে। এই কারণেই এ হাদীসকে ওলামায়ে কেরাম 'উম্মুস্সুন্নাহ' নামেও অভিহিত করেছেন। কোরআন পাকের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে সূরা ফাতেহায় অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে যেমন এ সূরাকে 'উম্মুল কিতাব' বলা হয়, তেমনিভাবে এই হাদীসটি ব্যাপক বিষয়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে 'উম্মুস্ সুন্নাহ' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ সহীহ মুসলিমকে— ভূমিকার পর— এই হাদীস দ্বারাই শুরু করেছেন। ইমাম বগভী (রহঃ) ও তাঁর উভয় সংকলন "মাছাবীহ্" এবং "শরহুস সুন্নাহ্" এর শুরুতে এ হাদীসটিই এনেছেন।

এ হাদীসটি এখানে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এটা মুসলিম শরীফের বর্ণনা। মুসলিম শরীফ এবং বুখারী শরীফ উভয় কিতাবে ঘটনাটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের অন্যান্য কিতাবে আরো কতিপয় সাহাবী থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলামের ভিত্তিমূল

(٣) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ – (رواه البخارى و مسلم)

৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) হজ্জ পালন করা। (৫) রমযানের রোযা রাখা। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপকভাষায় ইসলামকে এমন একটি ইমারতের সাথে তুলনা করেছেন, যা কয়েকটি স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো থাকে। তিনি এখানে বলে দিয়েছেন যে, ইসলামের এই ইমারত ও সৌধও এ পাঁচটি জিনিসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন মুসলমানের জন্য এ অবকাশ নেই যে, সে এইসব বিধি-বিধান পালনে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করবে। কেননা, এগুলো হচ্ছে ইসলামের মূল খুঁটি।

মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ এ পাঁচটি বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর বাইরেও অনেক জরুরী বিধি-বিধান রয়েছে, যেমন ঃ আল্লাহ্র পথে জেহাদ করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ইত্যাদি। কিন্তু এ পাঁচটি বিষয়ের যে গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এ বৈশিষ্ট্য যেহেতু অন্য বিধানাবলীতে নেই, তাই ইসলামের ভিত্তিমূল কেবল এ পাঁচটি জিনিসকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর ঐ সকল বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব উহাই, যা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে 'হাদীসে জিবরাঈল' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা হয়েছে। যার সারবস্তু এই যে, এই পঞ্চ রোকন ইসলামের জন্য দৃষ্ট অবয়বের মত। তাছাড়া এগুলোই আল্লাহ্র দাসত্বসুলভ এমন বিষয়, যা সত্তাগতভাবে কাম্য ও উদ্দেশ্য এবং এগুলোর অপরিহার্যতা কোন সাময়িক বিষয় ও কোন বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং এগুলো হচ্ছে মৌলিক ও স্থায়ী বিধি-বিধান। পক্ষান্তরে জেহাদ ও সৎ কাজের আদেশের বিষয়টি এমন নয়। কেননা, সেটা বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ পরিস্থিতিতে ফরয হয়ে থাকে।

ইসলামের বিধি-বিধান পালনের উপর জান্নাতের সুসংবাদ

(٤) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَىْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَّجِئَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْئَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا اِنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ وَ جَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَبِالَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ، قَالَ فَبِا لَّذِىْ اَرْسَلَكَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنْ عَلَيْنَا زَكٰوةً فِيْ اَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِا لَّذِىْ اَرْسَلَكَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِىْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِا لَّذِيْ اَرْسَلَكَ اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ، قَالَ ثُمَّ وَلّٰى وَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ – (رواه البخارى و مسلم)

৪। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া) কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের তখন এ বিষয়টি খুব ভাল লাগত যে, গ্রামাঞ্চল থেকে কোন বুদ্ধিমান বেদুঈন এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দ্বীনী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুক, আর আমরা তা শুনে উপকৃত হই। এমন অবস্থায় একদিন এক বেদুঈন ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে হাজির হল এবং নিবেদন করল ঃ হে মুহাম্মদ! আপনার এক প্রতিনিধি আমাদের কাছে এসে বলল, আপনি নাকি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে তোমাদের কাছে ঠিকই বলেছে। তারপর ঐ বেদুঈন জিজ্ঞাসা করল, আপনি বলুন তো, আসমান কে সৃষ্টি করেছে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ্। তারপর সে আবার প্রশ্ন করল, ভূমি কে সৃষ্টি করেছে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ্। বেদুঈন আবার প্রশ্ন করল, ভূমিতে এই পর্বতমালা কে স্থাপন করেছে এবং এর মধ্যস্থিত জিনিসসমূহ কে তৈরী করেছে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্। এবার বেদুঈন লোকটি বলে উঠল, ঐ মহান সত্তার শপথ, যিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং ভূমিতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, সেই আল্লাহ্ই কি আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তারপর বেদুঈন আবার বলতে শুরু করল ঃ আপনার প্রতিনিধি আমাদের কাছে এই কথাও বলেছে যে, আমাদের উপর নাকি দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটাও সে ঠিকই বলেছে। বেদুঈন বলল, শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, এটা আল্লাহ্রই নির্দেশ। বেদুঈন আবার বলল, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, আমাদের সম্পদে নাকি যাকাত ধার্য করা হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ এটাও সে ঠিক বলেছে। বেদুঈন বলল, শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এটা আল্লাহ্রই নির্দেশ। তারপর ঐ বেদুঈন আবার বলল, আপনার প্রেরিত প্রতিনিধি বলেছে যে, বছরে রমযান মাসের রোযাও নাকি আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এটাও সে ঠিকই বলেছে। বেদুঈন বলল, যে সত্তা আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তার শপথ! আল্লাহ্ই কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এটাও আল্লাহ্রই নির্দেশ। বেদুঈন আবার বলল, আপনার প্রতিনিধি আমাদেরকে এ কথাও বলেছে যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তার উপর বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করাও নাকি ফরয ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, সে এটাও ঠিক বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন যে, এই প্রশ্নোত্তর শেষে বেদুঈন চলে গেল এবং যাওয়ার সময় সে বলছিল, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এগুলোর মধ্যে কিছু বাড়িয়েও নেব না এবং কমও করব না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে যদি সত্যিই বলে থাকে, তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শুরু অংশে প্রশ্ন করার যে নিষেধাজ্ঞার কথাটি বলা হয়েছে, এর দ্বারা কোরআন পাকের ঐ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে ঃ হে মুমিনগণ!

তোমরা এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করো না, যা পরিব্যক্ত হলে তোমাদের কাছেই খারাপ লাগবে। (সূরা মায়েদাহ)

বাস্তব কথাও হচ্ছে এই যে, নতুন নতুন প্রশ্ন করা মানুষের একটি স্বভাব। কিন্তু এ অভ্যাসকে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছেড়ে দিলে এই ফল হয় যে, মানুষের মন ও আকর্ষণ তখন চুলচেরা তর্ক-বিতর্কের দিকেই বেশী অগ্রসর হয়। আর এতে কথার বিশ্লেষণের প্রবণতাই বেশী সৃষ্টি হয় এবং এ তুলনায় কর্ম ও আমল খুব কমই হয়ে থাকে। তাছাড়া এতে সময়ও নষ্ট হয়। বিশেষ করে যুগের নবীর কাছে অধিক প্রশ্ন করার একটি ক্ষতিকর দিক এটাও যে, নবীর পক্ষ থেকে যখন উত্তর আসে, তখন দেখা যায়, উম্মতের অনেক পাবন্দীও বেড়ে যায়।

যা হোক, এ সকল কারণেই অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে সাহাবায়ে কেরামকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারা নিজেরা প্রশ্ন খুবই কম করতেন এবং এ আশায় থাকতেন যে, কোন গ্রাম্য বেদুঈন এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করুক, আর এ সুযোগে আমরা কিছু শুনে শিখে নেই। কারণ, বেদুঈনদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অনেক অবকাশ ছিল। এ হাদীসেরই এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকেই বর্ণিত হয়েছে, "বেদুঈন লোকটি খুব দুঃসাহসের সাথে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল এবং নির্দ্বিধায় যা মনে আসছিল তাই জিজ্ঞাসা করছিল।" —ফতহুল বারী

বুখারী শরীফে এ হাদীসেরই বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষে যাবার সময় এই বেদুঈন বলেছিল ঃ আমি বনু সা'দ ইবনে বকর গোত্রের এক সদস্য, আমার নাম হচ্ছে যেমাম ইবনে সা'আলাবাহ। আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলাম।

বুখারীর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, এ লোকটি এসে প্রথমেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল যে, আমি আপনার কাছে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করব, তবে আমার প্রশ্নের ধরন কিছুটা শক্ত হবে। তাই বলে আপনি আমার উপর রাগ করবেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ তোমার মনে যা আসে তাই জিজ্ঞাসা কর। তারপর ঐ প্রশ্নোত্তর হল, যা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রশ্নকারী বেদুঈন যাওয়ার সময় কসম খেয়ে যে কথাটি বলেছিল যে, "আমি এতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করব না", সম্ভবত তার এ কথার এ উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি আপনার এ শিক্ষা ও দিক নির্দেশনার সম্পূর্ণ অনুসরণ করব এবং আমার মনের চাহিদায় এতে কোন প্রকার কমবেশী করব না। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, আমি আপনার এই পয়গাম ও বাণী অবিকল এভাবেই আমার গোত্রের কাছে পৌঁছে দিব এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন সংযোজন বা বিয়োজন করব না।

অন্যান্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এ বেদুঈন লোকটি নিজ গোত্রের কাছে গিয়ে খুব উদ্যমের সাথে দ্বীন প্রচারের কাজ শুরু করে দিলেন। তিনি প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে এমন সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বক্তব্য দিতে লাগলেন যে, তার কোন কোন নিকটাত্মীয় ও আপনজন তাকে বলল ঃ হে যেমাম! কুষ্ঠরোগ ও উন্মাদ হওয়া থেকে সাবধান থাক। (অর্থাৎ, দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ করে কুষ্ঠরোগে যেন আক্রান্ত না হয়ে যাও অথবা তুমি যেন পাগল না হয়ে যাও।)

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার তবলীগ ও দ্বীন প্রচারে এমন বরকত দান করলেন যে, সকাল বেলা যারা তাকে কুষ্ঠরোগ ও পাগলামীতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় দেখাচ্ছিল, সন্ধ্যা বেলায় তারাই

মূর্তিপূজা থেকে তওবা করে তওহীদের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল। ফলে সারা গোত্রে একটি প্রাণীও আর অমুসলিম রইল না।

(٥) عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ اَنَّ اَعْرَابِيًا عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَاَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ (اوْبِزِمَامِهَا) ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (اَوْيَا مُحَمَّدُ) اَخْبِرْنِىْ بِمَا يُقَرِّبُنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ فَكَفَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَ فِىْ اَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ (اَوْ لَقَدْ هُدِىَ) قَالَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَاَعَادَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَّ تُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحْمَ دَعِ النَّاقَةَ – (رواه مسلم)

৫। হযরত আবূ আইয়ুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অথবা তাঁর নাম নিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ!) আমাকে এমন বিষয়ের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতের কাছে পৌঁছে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন। (অর্থাৎ, তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য নিজের উষ্ট্রীকে থামিয়ে দিলেন।) তারপর তিনি নিজ সাথীদের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বললেন ঃ এ লোকটাকে ভাল তওফীক দান করা হয়েছে (অথবা বললেন ঃ তাকে খুবই হেদায়াত দান করা হয়েছে।) তারপর তিনি ঐ বেদুঈন প্রশ্নকারীকে বললেন ঃ আচ্ছা, তুমি আবার বল তো, কি বলছিলে। প্রশ্নকারী তখন পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করল। (অর্থাৎ, আমাকে ঐ বিষয়ের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে সরিয়ে রাখবে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করতে থাক এবং কোন বস্তুকে কোনভাবেই তাঁর সাথে শরীক করো না। নামায কায়েম রাখ, যাকাত প্রদান কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ ও তাদের হক আদায় করে চল। তারপর বললেন ঃ "এবার আমার উষ্ট্রী ছেড়ে দাও।" —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের পথ সুগমকারী ও জাহান্নাম থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী আমলসমূহের মধ্য থেকে কেবল (১) আল্লাহ্‌র খাঁটি এবাদত, (২) নামায কায়েম, (৩) যাকাত আদায় ও (৪) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কথাই উল্লেখ করেছেন। এমনকি রোযা এবং হজ্জের কথাও উল্লেখ করেননি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষের জন্য কেবল এ চারটি কাজই যথেষ্ট, এর বাইরে যেসব ফরয-ওয়াজিব রয়েছে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় অথবা গুরুত্বহীন। এমন মনে করা এবং হাদীসে এ ধরনের তথ্য আবিষ্কার করা কিছুতেই সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকারী একজন ছাত্রকে এ মূলনীতি সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য একজন স্নেহশীল শিক্ষক ও দয়ালু

মুরুব্বী, তিনি কোন লিখক ও গ্রন্থপ্রণেতা নন। আর একজন স্নেহশীল শিক্ষকের রীতি-পদ্ধতি এটাই হয় এবং এটাই সঠিক পদ্ধতি যে, তিনি যে ক্ষেত্রে যে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া বেশী উপযোগী মনে করেন, সে ক্ষেত্রে ততটুকুই বাতলে দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে লিখকদের রীতি এই যে, তারা যখন কোন বিষয়ের উপর কলম ধরেন, তখন এর চতুর্দিক এবং খুঁটিনাটি সকল বিষয় সেখানে আলোচনা করে থাকেন। তাই কোন স্নেহশীল শিক্ষক ও দীক্ষাগুরুর শিক্ষা এবং দীক্ষাকর্মেও ঐ লিখক ও কলাকুশলীদের এই রীতি-পদ্ধতি খুঁজতে যাওয়া আসলে নিজের বোধশক্তির অপরিপক্কতারই পরিচায়ক।

অতএব, রোযা, হজ্জ ও জেহাদ ইত্যাদির উল্লেখ যে এই হাদীসে করা হয়নি, এর কারণ এটাই যে, উপস্থিত সময়ে ঐ প্রশ্নকারীকে এই চারটি বিষয়ের উপদেশ ও উৎসাহ দানেরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর এর কারণও সম্ভবতঃ এই হবে যে, সাধারণতঃ এই চারটি বিষয়েই মানুষের পক্ষ হতে বেশী ত্রুটি হয়ে থাকে। অর্থাৎ, নামায কায়েম, যাকাত আদায় ও আত্মীয়তা রক্ষায় মানুষের অবহেলা ও ত্রুটি এবং আল্লাহ্র সাথে শরীক করার আশংকা অন্যান্য ক্ষেত্রের ত্রুটির চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। বর্তমানেও আমরা দেখি যে, রোযা এবং হজ্জ যাদের উপর ফরয, তাদের মধ্যে এগুলোর পরিত্যাগকারী এত অধিক নয়, যতটুকু নামায, যাকাত ও আত্মীয়তা রক্ষা তথা হুকূকুল ইবাদের বেলায় দেখা যায় অথবা প্রকাশ্য কিংবা গোপন কোন ধরনের শিরকে লিপ্ত হওয়ার যে প্রবণতা দেখা যায়। এমন মানুষ তো সম্ভবতঃ খুঁজেও পাওয়া যাবে না, যারা নামায, যাকাত ও অন্যান্য হুকূকুল ইবাদের বেলায় পূর্ণ যত্নবান, অথচ রোযা ও হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও এগুলো আদায় করে না। কিন্তু আপনি এমন লোকের সংখ্যা গুণেও শেষ করতে পারবেন না, যারা রমযান আসলে রোযা তো রেখে নেয়; কিন্তু নামাযের পাবন্দী করে না অথবা কেউ হজ্জ তো করে নেয়; কিন্তু যাকাত এবং আত্মীয়তা রক্ষা ইত্যাদি হুকূকুল ইবাদের বেলায় খুবই অবহেলা করে। সারকথা, এই কারণেই সম্ভবতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে কেবল এই চারটি বিষয়ের শিক্ষা দিয়েই বক্তব্য শেষ করেছেন।

মুসলিম শরীফে এ হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় শেষের দিকে এই বাক্যটিও এসেছে যে, যখন বেদুঈন লোকটি চলে গেল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই লোকটি যদি দৃঢ়ভাবে এই বিধানসমূহের উপর আমল করতে থাকে, তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

এই হাদীসের বর্ণনায় তিনটি স্থানে 'রাবী' নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছেন ঃ (১) উষ্ট্রীর লাগাম বুঝানোর জন্য ঊর্ধতন বর্ণনাকারী 'খেতাম' শব্দ ব্যবহার করেছেন, না 'যেমাম' শব্দ। (২) প্রশ্নকারী লোকটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করতে গিয়ে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলেছিলেন, না 'ইয়া মুহাম্মদ'। (৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছে লোকটি সম্পর্কে 'সে ভাল বিষয়ের তওফীক পেয়েছে' বলেছিলেন, না 'সে খুব হেদায়াত লাভ করেছে' বলেছিলেন। রাবীর এই সন্দেহ প্রকাশ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আমাদের হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কি পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং এ ব্যাপারে তারা আল্লাহ্কে কেমন ভয় করতেন যে, তিনটি স্থানে তাদের সন্দেহ হয়েছে যে, ঊর্ধতন রাবী এ শব্দ বলেছিলেন, না ঐ শব্দ। তাই তারা এ সন্দেহটুকুও প্রকাশ করে দিলেন, যদিও এ শব্দের ভিন্নতার কারণে অর্থে সামান্য কোন পার্থক্যও আসত না।

এই হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদেরও কিছুটা অনুমান করা যায় যে, তিনি সফরে বেরিয়েছেন, উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে যাচ্ছেন। (আর এটাও প্রকাশ্য বিষয় যে, তাঁর এ সফর অবশ্যই কোন দ্বীনী কাজ উপলক্ষ্যেই ছিল।) পথিমধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বেদুঈন ব্যক্তি এসে উষ্ট্রীর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে জান্নাতের পথ সুগমকারী ও জাহান্নাম থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী বিষয়ের কথা বলে দিন।" তিনি তার এই কর্মপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন না; বরং তার দ্বীনী আগ্রহের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছেন এবং নিজের সফরসঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন ঃ "সে খুব ভাল বিষয়ের তওফীক লাভ করেছে।" তারপর নিজের সাথীদেরকে প্রশ্নকারীর মুখে তার প্রশ্নটি শুনানোর জন্য বলছেন, "তুমি কি বলছিলে তা আবার বল।" তারপর তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এবং শেষে বলছেন, "এবার আমার উষ্ট্রী ছেড়ে দাও।"

আল্লাহু আকবার! পয়গাম্বরী কী জিনিস! স্নেহ ও দয়ার মূর্ত প্রতীক। তবে এখানে এ কথাটিও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, এই প্রশ্নকারী ছিল একজন বেদুঈন। তাই তার জন্য যা সাজে, অন্যের জন্যও তা শোভনীয় হবে এমন কথা নয়।

(٦) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّاْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهٖ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ ؟ فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهٗ فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَ ذَكَرَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكٰوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ - (رواه البخارى ومسلم)

৬। তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নজদ অঞ্চলের এক ব্যক্তি- যার মাথার চুলগুলো ছিল খুবই অবিন্যস্ত— রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে (কিছু বলতে বলতে) হাজির হল। আমরা তার গুন-গুন আওয়াজ শুনছিলাম; কিন্তু (আওয়াজ অস্পষ্ট থাকার কারণে এবং সম্ভবতঃ দূরত্বের কারণেও) আমরা তার কথা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে গেল। এবার দেখা গেল, সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। (অর্থাৎ, সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করল ঃ আমাকে ইসলামের ঐ বিশেষ বিধি-বিধান বাতলে দিন, মুসলমান হিসাবে যেগুলোর উপর আমল করা আমার জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী।) তিনি বললেন ঃ দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, (যেগুলো ফরয এবং ইসলামে এটাই সর্বপ্রথম দায়িত্ব।) লোকটি আরয করল, এগুলো ছাড়া আরো কোন নামায কি আমার জন্য অপরিহার্য ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না, (ফরয তো কেবল এই পাঁচ ওয়াক্তই) তবে তোমার এ

অধিকার আছে যে, তুমি নিজের পক্ষ থেকে এবং মনের খুশীতে এই পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছাড়াও আরো কিছু নফল নামায আদায় করবে (এবং বাড়তি সওয়াব লাভ করবে।) তারপর তিনি বললেন ঃ বছরে পুরা রমযান মাসের রোযা ফরয স্থির করা হয়েছে। (আর এটা ইসলামের দ্বিতীয় সাধারণ কর্তব্য।) সে জিজ্ঞাসা করল, রমযানের রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযাও কি আমার জন্য জরুরী ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না। (ফরয তো কেবল রমযানের রোযাই) তবে তোমার এই অধিকার আছে যে, তুমি মনের খুশীতে আরো কিছু নফল রোযা রাখবে, (এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অতিরিক্ত নৈকট্য ও সওয়াব লাভ করবে।) বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে ফরয যাকাতের কথাও আলোচনা করলেন। এখানেও প্রশ্নকারী লোকটি ঐ কথাই বলল যে, এই যাকাত ছাড়া অন্য কোন দান-খয়রাত করাও কি আমার জন্য জরুরী হবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। (ফরয তো কেবল যাকাত আদায় করাই) তবে তুমি মনের খুশীতে নফল দান-খয়রাত করতে পার, (এবং এভাবে বাড়তি সওয়াব লাভ করতে পার।) হাদীসের বর্ণনাকারী তাল্হা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ বলেন, তারপর প্রশ্নকারী লোকটি ফিরে গেল এবং ফিরে যাওয়ার সময় সে বলছিল ঃ (আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন) এতে আমি (নিজের পক্ষ থেকে) কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একথা শুনে বললেন ঃ লোকটি সফলকাম, যদি সে তার কথায় ঠিক থাকে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে শেষ রুকন তথা হজ্জের উল্লেখ নেই। এর একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, এই ঘটনাটিই হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বেকার। কেননা, প্রসিদ্ধ মত হিসাবে হজ্জ ফরয হওয়ার বিধানটি এসেছে অষ্টম অথবা নবম হিজরীতে। তাই এটা সম্ভব যে, এই ঘটনাটি এর পূর্বেকার।

দ্বিতীয়তঃ, একথাও বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে হজ্জ এবং ইসলামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আহ্কামের আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করার সময় আলোচনাটি সংক্ষেপ করে দিয়েছেন। একটু অনুসন্ধান করলে বিষয়টি এমনই মনে হয়। প্রমাণ হিসাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত এই হাদীসেরই একটি বর্ণনা পেশ করা যায়, যেখানে নামায, রোযা এবং যাকাতের আলোচনার পর হাদীসের বর্ণনাকারী তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই শব্দমালাও বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে ইসলামের অনেক বিধান বাতলে দিলেন। (তাই এখানে হয়তো হজ্জের বিধানটিও উল্লেখ করেছিলেন।)

ইসলামের বিধি-বিধানের দাওয়াত প্রদানে ধারাবাহিকতা ও ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعَاذِبْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ سَتَاْتِىْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلَى اَنْ يَّشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذَالِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذَالِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ

فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ – (رواه البخارى ومسلم)

৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামন পাঠালেন, তখন তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে বললেন ঃ তুমি সেখানে আহ্লে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। অতএব, তুমি যখন তাদের কাছে যাবে, তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে এই কথার দিকে আহ্বান করবে যে, তারা যেন মনেপ্রাণে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল। তারা যদি তোমার এই কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলে দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারপর তারা যখন তোমার এ কথাও মেনে নেবে, তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর যাকাতও ফরয করেছেন, যা তোমাদের বিত্তবানদের থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদেরই গরীব ব্যক্তিদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হবে। তারপর তারা যদি তোমার একথাটিও মেনে নেয়, তাহলে (যাকাত আদায় করার সময় বেছে বেছে) তাদের মূল্যবান সম্পদ নিয়ে নেবে না। আর মজলূমের বদদো'আকে ভয় কর। কেননা, তার মাঝে এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা ও অন্তরায় থাকে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী প্রমুখ কতিপয় আলেমের অনুসন্ধান অনুযায়ী ১০ম হিজরীতে, আর অধিকাংশ সীরাতকার ও ঐতিহাসিকের মত অনুযায়ী ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনের শাসনকর্তা হিসাবে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাকে বিদায় দেওয়ার সময় ইয়ামনবাসীকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিছু লোকের দৃষ্টিতে এই হাদীসেও এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল নামায-রোযার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, অথচ ঐ সময় রোযা এবং হজ্জ ফরয হওয়ার বিধানটিও এসে গিয়েছিল। হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ নিজেদের উপলব্ধি অনুযায়ী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই অধমের নিকট এসব ব্যাখ্যার মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও মনঃপূত ব্যাখ্যা এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আযকে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সেখানে ইসলামের সকল বিধি-বিধান বর্ণনা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, ইসলাম গ্রহণের পর একজন মুসলমানের জন্য যেগুলো পালন করা অপরিহার্য হয়ে যায়। তাঁর উদ্দেশ্য কেবল এই ছিল যে, দ্বীনের দাওয়াত ও ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারের বেলায় একজন দাওয়াতদানকারী ও শিক্ষককে যে ক্রমধারা ও ক্রমোন্নতির নীতি অনুসরণ করতে হয়, হযরত মো'আযকে তাই বলে দেওয়া। আর নীতিটি হচ্ছে এই যে, ইসলামের সকল বিধি-বিধান ও আবেদন এবং শরীঅতের সকল আদেশ-নিষেধ একসাথে মানুষের সামনে তুলে ধরবে না। কেননা, এমন করলে ইসলাম গ্রহণ করাই মানুষের জন্য কঠিন মনে হবে; বরং সর্বপ্রথম তাদের সামনে তওহীদ ও রেসালতের বিষয় পেশ করবে। যখন তারা এটা গ্রহণ করে নেবে, তখন তাদেরকে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যিনি আমাদের এবং তোমাদের একক রব এবং

লা-শারীক মাওলা, তিনি আমাদের সবার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারপর তারা যখন এ বিষয়টিও মেনে নেবে, তখন বলবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সম্পদে যাকাতও ফরয করেছেন, যা সমাজের বিত্তবানদের থেকে আদায় করে অভাবী শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে।

যাহোক, হযরত মো'আয (রাঃ)কে এই নির্দেশনা দেওয়ার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল দাওয়াত ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে ক্রমধারা ও ক্রমোন্নতির প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতির অনুসরণ করতে হয়, তা বলে দেওয়া। অন্যথায় ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের জ্ঞান তো হযরত মো'আযের পূর্বেই ছিল। তাই এ ক্ষেত্রে সবগুলো বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না।

তাছাড়া এ ব্যাপারেও তো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইসলামের বিধি-বিধানের মধ্যে নামায এবং যাকাতই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন মজীদেও এ দু'টি বিষয়ের প্রতিই জোর তাকীদ করা হয়েছে, যার একটি কারণ এও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি এই দু'টি বিধান পালন করবে, তার জন্য অন্যান্য আহ্কাম ও ফরযসমূহ আদায় করা অনেক সহজ হয়ে যাবে, যেমনটি অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ দর্শনেও বুঝা যায়। এ ছাড়া মানুষের মন-মানসিকতা সুন্দর ও সুস্থ করে গড়ে তুলতে এই দু'টি জিনিসের বিশেষ ভূমিকা থাকে। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে কেবল এ দু'টি বিধানের আলোচনা করা হয়। যেমন, সূরা বায়্যেনায় এরশাদ হয়েছে ঃ "তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হচ্ছে সঠিক ধর্ম।" অনুরূপভাবে সূরা তওবায় এরশাদ হয়েছে ঃ "তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" সামনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস আসছে, সেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মানুষের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দেবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। অতএব, উপরোল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসমূহে ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহের মধ্যে কেবল নামায ও যাকাতের কথা উল্লেখ করার এটিও একটি কারণ।

ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা প্রসঙ্গে এই দিকনির্দেশনা দেওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মো'আযকে একটি উপদেশ দিলেন যে, যখন যাকাত সংগ্রহ করার সময় আসবে, তখন এমনটি করতে যাবে না যে, মানুষের সম্পদ তথা উৎপন্ন ফসল ও গবাদি পশুর মধ্য থেকে কেবল উত্তম ও মূল্যবান জিনিসগুলো বাছাই করতে যাবে; বরং যে প্রকার সম্পদ হবে সেখান থেকে মধ্যম মানের জিনিসটি আদায় করবে।

সর্বশেষ উপদেশ তিনি এই দিয়েছিলেন যে, দেখ! মজলূমের বদদো'আ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। (অর্থ এই যে, তুমি একটি অঞ্চলের শাসক হয়ে যাচ্ছ। তাই সাবধান! কখনো কারো প্রতি যেন জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি না হয়।) কেননা, মজলুমের দো'আ এবং আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে কোন পর্দা ও অন্তরায় থাকে না; সেটা কবূল হয়েই যায়।

মুসনাদে আহ্মাদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন ঃ মজলূমের দো'আ কবূল হয়েই থাকে,

সে যদি পাপাচারীও হয়। পাপাচারী হলে তার পাপের ভোগান্তি তারই জন্য থাকবে। —ফতহুল বারী, উমদাতুল কারী

অর্থাৎ, পাপাচারী হওয়া সত্ত্বেও জালেমের বিরুদ্ধে তার বদদো'আ কবূল হয়ে যাবে।

মুসনাদে আহমাদেই হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনাসূত্রে এই শব্দমালাও এসেছে ঃ মজলূমের বদদো'আ অবশ্যই কবূল হয়ে থাকে, এমন কি সে যদি কাফেরও হয়। কেননা, এখানে কোন অন্তরায় থাকে না। —উমদাতুল কারী

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ এ হাদীস দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রেসালতের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর আনীত শরীঅতের উপর চলা পূর্ববর্তী নবী ও পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহের অনুসারী 'আহ্‌লে কিতাবে'র জন্যও জরুরী। পূর্ববর্তী ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের এ যুগে মুসলমান বলে কথিত লোকদের মধ্য থেকে কোন কোন লেখা-পড়া জানা মানুষও এই ধারণা প্রকাশ করে যে, "ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মত সম্প্রদায়গুলো তাদের পুরাতন শরীঅত অনুসরণ করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের মুক্তি লাভ করতে পারবে এবং তাদের জন্য ইস্‌লামী শরীঅতের অনুসরণ জরুরী নয়।" এ ধরনের মত পোষণকারীরা হয়তো দ্বীন এবং দ্বীনের মূলনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা আসলে এরা মুনাফেক। সামনের হাদীসে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না এবং তাঁর আনীত দ্বীনকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেবে না, সে নাজাত ও মুক্তি লাভ করতে পারবে না

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِيَدِهٖ لاَ يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىْ وَلاَ نَصْرَانِىْ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ – (رواه مسلم)

৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সুত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন, এ উম্মতের (অর্থাৎ এ যুগের) যে কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান আমার সংবাদ শুনবে, (অর্থাৎ, আমার নবুওয়াতের দাওয়াত তার কানে পৌঁছবে) তারপরও সে আমার প্রতি এবং আমার আনীত দ্বীনের প্রতি ঈমান না এনেই মারা যাবে, সে অবশ্যই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের কথা কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের মত স্বীকৃত আহলে কিতাবও যখন শেষ নবীর প্রতি ঈমান না এনে এবং তাঁর আনীত দ্বীন ও শরীঅত গ্রহণ না করে মুক্তি লাভ করতে পারবে না, তাহলে অন্যান্য কাফের ও মুশরিকদের পরিণতি কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

যাহোক, হাদীসের বিষয়বস্তুটি ব্যাপক এবং এর মর্ম হচ্ছে এই যে, এ মুহাম্মদী যুগে (যার সূচনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে এবং

কেয়ামত পর্যন্ত যা চালু থাকবে) যার কাছে তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের দাওয়াত পৌঁছবে আর সে তাঁর প্রতি ঈমান না এনে এবং তাঁর আনীত দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ না করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে যাবে যদিও সে কোন পূর্ববর্তী নবীর দ্বীন ও তাঁর আনীত কিতাব ও শরীঅতের অনুসারী কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানই হোক না কেন।

সারকথা, খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁর প্রতি ঈমান না এনে এবং তাঁর শরীঅত কবূল না করে কারো পক্ষে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যার কাছে তাঁর নবুওয়াতের সংবাদ এবং ইসলামের দাওয়াতই পৌঁছেনি, সে হবে ক্ষমার্হ। এ বিষয়টি দ্বীন ইসলামের অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করা কেবল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রেসালতের পদমর্যাদা উপলব্ধি না করার কারণেই হতে পারে।

(٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ رَجُلاً مِنَ النَّصَارٰى مُتَمَسِّكًا بِالْاِنْجِيْلِ وَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ مُتَمَسِّكًا بِالتَّوْرَاةِ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ سَمِعَ بِىْ مِنْ يَهُوْدِيٍّ اَوْ نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعْنِىْ فَهُوَ فِى النَّارِ – (اخرجه الدار قطنى فى الافراد)

৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একজন খৃষ্টান ব্যক্তি ইনজীলের অনুসরণ করে, অনুরূপভাবে একজন ইয়াহুদী তাওরাতের উপর আমল করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসও রাখে, কিন্তু আপনার দ্বীনের অনুসরণ করে না। আপনি বলুন তো, তাদের জন্য কি বিধান ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান আমার নবুওয়াতের কথা শুনবে, অথচ আমার অনুসরণ করবে না, সে হবে জাহান্নামী। —দারাকুতনী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীসটি উপরে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের চেয়েও এ বিষয়ে অধিক স্পষ্ট যে, কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকারও করে নেয়, (অর্থাৎ, সে যদি তওহীদে বিশ্বাসী হয় এবং রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী বলে স্বীকারও করে নেয়,) কিন্তু তাঁর আনীত শরীঅতের পরিবর্তে তাওরাত ও ইনজীলেরই অনুসরণ করে যায় এবং এটাকেই নিজের মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করে, তাহলে সে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। এ সত্যটিকেই কুরআন মজীদের এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩১)

ব্যাখ্যা ঃ হে নবী! (যে সব লোক আপনার শরীঅত অনুসরণ না করেই আল্লাহ্কে পেতে চায় এবং তাঁর ক্ষমা লাভের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদেরকে) আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্কে চাও, তাহলে (এখন আর এর কোন বিকল্প পথ নেই যে,) তোমরা

আমার শরীঅতের অনুসরণ করবে। (যদি তোমরা এমনটি কর তাহলে) আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। (আর যদি তোমরা আমার অনুসরণ না কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্র ভালবাসা ও তাঁর ক্ষমা লাভের অধিকারী হতে পারবে না।)

সত্যিকার ঈমান ও ইসলাম মানুষের মুক্তির গ্যারান্টি

(١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَوْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (شَكَّ الْاَعْمَشُ) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَاَكَلْنَا وَدَّهَنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِفْعَلُوْا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلٰكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَ فِىْ ذَالِكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَعَمْ فَدَعَا بِنِطْعٍ فَبُسِطَ ثُمَّ دَعٰى بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْئُ بِكَفِّ ذُرَةٍ قَالَ وَجَعَلَ يَجِيْئُ الْاٰخَرُ بِكَفِّ تَمَرٍ قَالَ وَيَجِيئُ الْاٰخَرُ بِكَسْرَةٍ حَتّٰى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطْعِ مِنْ ذَالِكَ شَيْئٌ يَسِيْرٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ خُذُوْا فِىْ اَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَاَخَذُوْا فِىْ اَوْعِيَتِهِمْ حَتّٰى مَا تَرَكُوْا فِى الْعَسْكَرِ وِعَاءً اِلَّا مَلَئُوْهُ قَالَ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ - (رواه مسلم)

১০। আ'মাশ নামক তাবেয়ী আপন উস্তাদ আবু সালেহ থেকে এ সন্দেহ সহকারে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা অথবা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাবুক যুদ্ধের সময় যখন (মুসলমানদের সব পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল এবং) ক্ষুধার খুব কষ্ট শুরু হল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি অনুমতি দান করেন, তাহলে আমরা আমাদের পানি বহনকারী উটগুলি যবেহ করে এর গোশ্ত খেয়ে নিতে পারি এবং তেলও সংগ্রহ করে নিতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, তাই কর। বর্ণনাকরী বলেন, এমন সময় ওমর (রাঃ) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি এমনটি করেন, (অর্থাৎ, লোকদেরকে যদি উট যবেহ করার অনুমতি দিয়ে ফেলেন আর তারা এগুলো যবেহ করে ফেলে) তাহলে আমাদের বাহনের সংখ্যা কমে যাবে। (তাই দয়া করে এমন যেন না করা হয়।) তবে আপনি তাদেরকে তাদের হাতে সঞ্চিত যৎসামান্য খাদ্য-সামগ্রীসহই আপনার কাছে আসতে বলুন। তারপর এতেই তাদেরকে বরকত দেওয়ার জন্য আপনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। হয়তো এতেই আল্লাহ্ তাদেরকে বরকত দান করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর তিনি চামড়ার তৈরী একটি বড় দস্তরখান আনতে বললেন এবং তা এনে বিছানো হল। তারপর তিনি সবাইকে নিজেদের উদ্বৃত্ত খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসতে বললেন। দেখা গেল, কেউ তখন এক মুঠো চিনার দানা নিয়ে হাজির হচ্ছে, কেউ এক মুঠো

খেজুর নিয়ে আসছে আবার কেউ রুটির একটি টুকরা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। এভাবে দস্তরখানে অল্প বিস্তর খাদ্য-সামগ্রী জমা হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে বরকতের দো'আ করলেন এবং সবাইকে বললেন, এখন তোমরা এখান থেকে নিজ নিজ পাত্র ভরে নিয়ে যাও। কথা মত সবাই নিজ নিজ পাত্র পূর্ণ করে নিল। এমনকি (ত্রিশ হাজার সৈন্যের এই বাহিনীর) লোকেরা একটি পাত্রও অপূর্ণ রাখল না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারপর সবাই আহার করল এবং তৃপ্তিসহকারেই আহার করল, এরপরও কিছু উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। এই অবস্থাদৃষ্টে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র যে কোন বান্দা কোন সংশয়-সন্দেহ ছাড়া পূর্ণ বিশ্বাসসহ এ দু'টি সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হবে না।" —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বিষয়বস্তুটি স্পষ্ট। এখানে যে উদ্দেশ্যে হাদীসটি আনা হয়েছে, এর সম্পর্ক হাদীসের শেষাংশের সাথে, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র তওহীদ ও নিজের রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান করে এই ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এই দু'টি সাক্ষ্য প্রদান করে ও তার অন্তর ও মস্তিষ্কে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের রোগ না থাকে এবং এই ঈমানী অবস্থায় তার মৃত্যু আসে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যারা কুরআন হাদীসের বাক-পদ্ধতি ও বর্ণনা-ভঙ্গী সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকেফহাল, তারা জানে যে, এসব ক্ষেত্রে "আল্লাহ্র তওহীদ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান"-এর অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানী দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং তাঁর আনীত দ্বীন ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে বরণ করে নেওয়া। এই জন্যই এই দুই কথার সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ যুগযুগ ধরে এটাই মনে করা হয় যে, ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানী দাওয়াতকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে বরণ করে নিয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের মর্ম এটাই যে, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে আমার ঈমানী দাওয়াত গ্রহণ করে নিয়ে ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেবে, সে যদি এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হয় এবং এ বিশ্বাস নিয়েই মারা যায়, তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

অতএব, কেউ যদি শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এই কথা মুখে স্বীকার করে নেয়; কিন্তু ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ না করে, বরং অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে অথবা তওহীদ ও রেসালত ছাড়া অন্য কোন ঈমানী বিষয়কে অস্বীকার করে, যেমন কেয়ামত অথবা কুরআন মজীদকে সত্য বলে স্বীকার না করে, তাহলে সে কখনো এ সুসংবাদের অধিকারী হবে না।

মোটকথা, এ হাদীসে তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানী দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেওয়া। অনুরূপভাবে যেসব হাদীসে শুধু তওহীদের উপর অথবা কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র স্বীকৃতির উপর জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে সেখানেও এই অর্থই গ্রহণ করতে

হবে। আসলে এগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানী দাওয়াত গ্রহণ ও ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে কবূল করে নেওয়ারই বিভিন্ন পরিচিত শিরোনাম। ইনশাআল্লাহ এর আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনা সামনের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার সময় করা হবে।

এ হাদীস থেকে আনুসঙ্গিকভাবে আরো কয়েকটি শিক্ষা লাভ করা যায় ঃ

(১) কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব, এমনকি আল্লাহ্র কোন নবী-রাসূলও যদি কোন বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেন আর কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ খাদেমের দৃষ্টিতে এতে কোন ক্ষতিকর দিক নজরে আসে, তাহলে সে বিনয়ের সাথে নিজের মত ও পরামর্শ পেশ করতে কুণ্ঠিত হবে না। আর বড় ব্যক্তির জন্যও উচিত হবে এতে চিন্তা-ভাবনা করা। তারপর যদি দ্বিতীয় মতটিই ভাল এবং বেশী উপযোগী মনে হয়, তাহলে নিজের পূর্বমত থেকে ফিরে এসে দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণ করে নেওয়া। (যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনায় হযরত ওমরের মতটি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।)

(২) দো'আ কবূল হওয়া, বিশেষতঃ অলৌকিকভাবে দো'আর ফল প্রকাশ পাওয়া-এটা আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন এবং বান্দার জন্য আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার পরিচায়ক। এর দ্বারা মু'মিনদের অন্তরের প্রশান্তি ও বক্ষ উন্মোচনে উন্নতি হওয়াই যথার্থ, বরং এটা নবুওয়াতের উত্তরাধিকার। (যেমন, এক্ষেত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালেমায়ে শাহাদত পাঠ দ্বারা প্রকাশ্যভাবেই এ বিষয়টি বুঝা যায়।) অতএব, আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন ও তাঁর অনুগ্রহের অর্থাৎ, মু'জেযার আলোচনা করলে যাদের অন্তর উন্মোচিত হওয়ার পরিবর্তে সংকুচিত হয়ে আসে অথবা যারা এই ধরনের অলৌকিক বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা ও বিদ্রূপ করে, মনে করতে হবে যে, তাদের অন্তর ভীষণ রোগে আক্রান্ত।

(١١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ – (رواه مسلم)

১১। হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসটির ব্যাখ্যার যেমন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এখানেও সেই আলোকেই ধরে নিতে হবে যে, এ হাদীসে তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দানের অর্থ হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী চলা। অন্য শব্দে একথাও বলা যায় যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এ কথার সাক্ষ্য দানের মধ্যে সম্পূর্ণ ইসলাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে, সে আসলে পূর্ণ ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নিয়েছে। এখন যদিও একান্ত মানবীয় দুর্বলতার কারণে তার পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েই যায়, তাহলে তার ঈমানী অনুভূতিই তাকে শরীঅতনির্ধারিত পন্থায় কাফ্ফারা আদায় করে অথবা তওবা করে পবিত্র হয়ে যেতে বাধ্য করবে। তাই সে যদি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদই থাকবে।

(١٢) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اِلَّا مُؤْخَّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْك ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَن يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ * (رواه البخارى ومسلم واللفظ له)

১২। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই সওয়ারীতে আরোহী ছিলাম। আমি এমনভাবে সওয়ারীর পেছনে বসা ছিলাম যে, আমার মাঝে ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে উটের হাওদার পেছনের অংশ ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় ছিল না। (অর্থাৎ, আমি হুযূরের পেছনে সম্পূর্ণ মিশে বসা ছিলাম।) এমন সময় তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে মো'আয ইবনে জাবাল! আমি উত্তর দিলাম, আমি হাজির আছি, আপনি বলুন। তারপর কিছু সময় চলার পর তিনি আবার বললেন ঃ হে মো'আয ইবনে জাবাল! আমি উত্তর দিলাম, আমি হাজির আপনি বলুন। তারপর আরো কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললেন ঃ হে মো'আয ইবনে জাবাল! আমি বললাম, আমি হাজির আপনি বলুন। (এই তৃতীয়বারে) তিনি বললেন ঃ তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্র কি হক ও দাবী রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহ্র এ হক রয়েছে যে, তারা কেবল আল্লাহ্রই এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। তারপর কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললেন ঃ হে মো'আয ইবনে জাবাল! আমি উত্তর দিলাম, আমি হাজির, আপনি বলুন। তিনি তখন বললেন ঃ তুমি কি জান, বান্দারা যখন আল্লাহ্র এ হক আদায় করে নেবে, তখন তাদের কি হক থাকে আল্লাহ্র উপর? আমি উত্তরে বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ তাদের এই হক থাকে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে আযাবে ফেলবেন না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ঃ (১) হযরত মো'আয (রাঃ) মূল হাদীস বর্ণনা করার আগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই সওয়ারীতে আরোহণ ও হুযূরের সাথে একেবারে মিশে বসার বিষয়টি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, এর কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহদৃষ্টি হযরত মো'আযের প্রতি ছিল এবং দরবারে নবুওয়াতে তিনি যে নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন, এ বিষয়টি শ্রোতাদের চোখের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা বুঝে নিতে পারে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আযের কাছে এমন একটি কথা কেন

বললেন, সাধারণ মুসলমানদের কাছে যা প্রকাশ করতে তিনি রাজী ছিলেন না। যেমন, সামনের হাদীসে এ বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ আসবে।

দ্বিতীয় কথা এই বলা যায় যে, সম্ভবতঃ হযরত মো'আয (রাঃ) হাদীসটির ব্যাপারে নিজের প্রত্যয় ব্যক্ত করার জন্য এত বিস্তারিতভাবে অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ, শ্রোতাদেরকে তিনি বুঝাতে চান যে, এ হাদীসটি আমার এমন স্মরণ আছে যে, হাদীস বর্ণনা করার সময়কার সব খুঁটিনাটি অবস্থাও আমি বলতে পারি, সব কিছুই আমার কাছে সংরক্ষিত।

তৃতীয় কারণ এও হতে পারে যে, প্রেমিকদের যেমন অভ্যাস থাকে যে, তারা ভালবাসার স্মৃতি ও প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যের বিষয়গুলো অত্যন্ত আবেগের সাথে মজা নিয়ে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে থাকে, সেই হৃদয়ানুভূতি নিয়েই হযরত মো'আয হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যের কথাগুলো এভাবে বর্ণনা করেছেন।

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে হযরত মো'আযকে তিনবার ডাক দিলেন এবং তিনি যা বলতে চাচ্ছিলেন তার একাংশ মাত্র তৃতীয় দফায় বললেন এবং দ্বিতীয় অংশটি আবার কিছুটা বিরতি দিয়ে চতুর্থবারে বললেন, এর রহস্য কি? এর উত্তরে হাদীস ব্যখ্যাতাগণ লিখেছেন যে, সম্ভবতঃ এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আযের মনোযোগ আকর্ষণ করছিলেন, যাতে তিনি আপাদ-মস্তক কান হয়ে পূর্ণ আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে এবং চিন্তা-ভাবনার সাথে তাঁর বক্তব্যটি শ্রবণ করেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এ করা হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ব্যাপারে সংশয় ও দ্বিধা ছিল যে, মো'আয (রাঃ)-এর নিকট তিনি এ কথাটি বলবেন, না না বলাই ভাল হবে। এ জন্যই তিনি প্রথম তিনবার বিরত থাকলেন এবং পরে যখন মনে সায় দিল, তখন বলেই ফেললেন। কিন্তু এ অধম সংকলকের কাছে এ দু'টি ব্যাখ্যাই অপেক্ষাকৃত কম গ্রহণযোগ্য। অধিক যুক্তিযুক্ত ও উপযোগী ব্যাখ্যা এ মনে হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তখন বিশেষ ধ্যানমগ্নতার অবস্থা বিরাজ করছিল। তিনি হযরত মো'আযকে সম্বোধন করতেন এবং কিছু বলার পূর্বেই ঐ ধ্যানমগ্নতায় ফিরে যেতেন। এই কারণেই সম্বোধন ও বক্তব্য প্রদানের মাঝে এ বিলম্ব ও বিরতি ঘটেছে। বাকী আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(৩) মূল হাদীসের সারকথা শুধু এটাই যে, বান্দাদের উপর আল্লাহ্র এ হক ও দাবী রয়েছে যে, তারা তাঁর এবাদত ও গোলামী করে যাবে এবং কোন বস্তুকেই তাঁর সাথে শরীক করবে না। আর তারা যখন আল্লাহ্র এ হক আদায় করে নেবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও নিজের জিম্মায় তাদের এ হক সাব্যস্ত করে নিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে আযাবে ফেলবেন না।

এ হাদীসেও "আল্লাহ্র এবাদত করা এবং শিরক পরিহার করা" দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বীনে তওহীদ অর্থাৎ ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং এর উপর জীবন অতিবাহিত করা। যেহেতু সে সময়ে ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং স্পষ্ট পার্থক্যকারী জিনিস তওহীদ এবং শিরকই ছিল, এ জন্য এই হাদীসে (এবং কতিপয় অন্যান্য হাদীসেও) এই শিরোনাম অবলম্বন করা হয়েছে। তাছাড়া এটাও বাস্তব কথা যে, আল্লাহ্র এবাদত ও গোলামী করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকাই ইসলামের প্রাণ এবং এর মূল ভিত্তি। এ জন্যও অনেক জায়গায় ইসলামের জন্য এ শিরোনাম অবলম্বন করা হয়। এ কথার সমর্থন (যে, এ হাদীসে আল্লাহ্র এবাদত করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার অর্থ দ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়া) এর দ্বারাও পাওয়া যায়

যে, বুখারী ও মুসলিমেই হযরত মো'আয বর্ণিত এ হাদীসেরই এক বর্ণনায় তওহীদ ও রেসালত উভয়টির উপর ঈমান আনা এবং উভয়টির সাক্ষ্যদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। (হাদীসটি ১৩ নং ক্রমিকে আসছে।) আর অন্য এক বর্ণনায় তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের সাথে নামায এবং রোযারও উল্লেখ রয়েছে। (এই বর্ণনাটি মুসনাদে আহ্মদের বরাতে সামনের হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটু পরেই আসবে।)

(١٣) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَاذٌ رَدِيْفُهٗ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَاذ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ ثَلاَثًا قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهٖ اِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُخْبِرُبِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا فَاَخْبَرَبِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَاَثُّمًا * (رواه البخارى و مسلم)

১৩। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় যখন মো'আয (রাঃ)কে নিজের সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে সফর করছিলেন, তখন তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে মো'আয! মো'আয উত্তর দিলেন, আমি হাজির। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন ঃ হে মো'আয! তিনি উত্তর দিলেন, আমি হাজির। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে মো'আয! তিনি উত্তর দিলেন, আমি হাজির। তিনবার এভাবে ডাকার পর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তিকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দেবেন। হযরত মো'আয এ সুসংবাদ শুনে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি লোকদেরকে এ সংবাদ শুনিয়ে দেব না, যাতে তারা আনন্দ লাভ করতে পারে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ এমন করলে তো তারা এর উপর ভরসা করেই বসে থাকবে। তারপর মো'আয (রাঃ) এলম গোপন করার গুনাহের ভয়ে নিজের মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি মানুষের কাছে বর্ণনা করে গিয়েছেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ১২ ও ১৩ নং হাদীসের প্রাথমিক অবতরণিকা দেখে মনে হয় যে, উভয়টির সম্পর্ক একই ঘটনার সাথে। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথম হাদীসে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের জন্য "আল্লাহ্র এবাদত ও শিরক বর্জনের" শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় হাদীসে এ অর্থ বুঝানোর জন্য "তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান" কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এ কথার সমর্থন এর দ্বারাও পাওয়া যায় যে, এ সুসংবাদ সম্পর্কিত তৃতীয় আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত মো'আয (রাঃ) তওহীদের সাথে নামায এবং রোযার কথাও উল্লেখ করেছেন। এ তৃতীয় রেওয়ায়াতটি মুসনাদে আহমাদের বরাতে মেশকাত শরীফে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার শব্দমালা নিম্নরূপ ঃ যে ব্যক্তি শিরক থেকে পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে ও রমযানের রোযা রাখবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া

হবে। মো'আয বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদেরকে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দেব না ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাদেরকে আরো আমল করতে দাও।

এ তিনটি রেওয়ায়াতের শিরোনাম যদিও ভিন্ন এবং বাহ্যিক শব্দমালায় কোনটি সংক্ষিপ্ত ও কোনটি কিছুটা বিস্তারিত হওয়ার কারণে অভিন্নতা বুঝা যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি রেওয়ায়াতের মর্ম এটাই যে, যে কেউ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে, (যার মৌলিক বিধানাবলী হচ্ছে শিরক বর্জন করা, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান করা ও নামায-রোযা ইত্যাদি পালন করা,) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার নাজাত ও মুক্তির চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

অতএব, যেসব লোক এ ধরনের হাদীস দ্বারা এই ফল আবিষ্কার করে যে, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান ও শিরক থেকে বেঁচে থাকার পর মানুষ যতই মন্দ আকীদা ও মন্দ আমলের অধিকারীই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় সে আল্লাহ্র আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শও করতে পারবে না, তারা আসলে এই সুসংবাদ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম ও আবেদন বুঝতেই সক্ষম হয়নি। তাছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ের যে শত শত হাদীস এমনকি কুরআনের অনেক আয়াতও তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার স্পষ্ট বিপরীত, তারা সেগুলো থেকেও চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

(١٤) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (رواه احمد)

১৪। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কথার সাক্ষ্যপ্রদান হচ্ছে জান্নাতের চাবি। —মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও কেবল তওহীদের সাক্ষ্য প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর অর্থও ঈমানী দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে বরণ করে নেওয়া। এ বাচনভঙ্গিটি ঠিক সেইরূপ, যেমন আমাদের বাকপদ্ধতিতে 'কালেমা পড়ে নেওয়াকে' ইসলাম গ্রহণ করার অর্থে প্রয়োগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ হাদীসগুলো বলেছিলেন, তখনকার সময়ে মুসলমান এবং অমুসলিম, কাফের, মুশরিকরাও তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়াই বুঝত।

(١٥) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَ هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَ قَدْ اِسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذَالِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قَالَ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قَالَ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قَالَ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ * (رواه البخاری و مسلم)

১৫। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি এ সময় সাদা কাপড় গায়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। একটু পরে আমি আবার হাজির হলাম, তখন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গিয়েছিলেন, এ সময় তিনি বললেন ঃ যে কোন বান্দা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে এবং এ বিশ্বাসের উপরই তার মৃত্যু এসে যায়, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। আবূ যর বলেন, আমি নিবেদন করলাম, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে। আবূ যর বলেন, আমি আবার নিবেদন করলাম, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে। আবূ যর বলেন, আমি আবার আরয করলাম, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন ঃ হ্যাঁ, আবূ যরের কাছে খারাপ লাগলেও সে জান্নাতে যাবে যদিও সে ব্যভিচার করে থাকে, যদিও সে চুরি করে থাকে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ দ্বীনে তওহীদ তথা ইসলামের উপর ঈমান আনা এবং জীবনে এটাকেই অবলম্বন করে থাকা। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি দ্বীনে তওহীদের উপর আন্তরিকভাবে ঈমান রাখবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। এখন সে যদি ঈমান সত্ত্বেও কিছু গুনাহ করে ফেলে থাকে, তাহলে সে যদি কোন কারণে ক্ষমা লাভের অধিকারী হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দিয়ে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়েই তাকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন। আর যদি সে ক্ষমার যোগ্য না হয়, তাহলে গুনাহর শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যেতে পারবে। যা হোক, ইসলামের প্রতি আন্তরিকভাবে ঈমান পোষণকারী প্রত্যেকটি মানুষ জান্নাতে অবশ্যই যাবে, যদিও জাহান্নামে গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পরেই যাক না কেন। হযরত আবূ যর (রাঃ)-এর এই হাদীসের মর্ম ও শিক্ষণীয় বিষয় এটাই।

হযরত আবূ যর (রাঃ) যে বার বার প্রশ্ন করছিলেন যে, ব্যভিচার এবং চুরি করলেও কি মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে ? এর কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, চুরি এবং ব্যভিচারকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অপবিত্র গুনাহ্ মনে করার কারণে তিনি আশ্চর্যবোধ করছিলেন যে, এমন গুনাহ করেও মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে!

(١٦) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ * (رواه مسلم)

১৬। হযরত ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা গেল যে, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, সে জান্নাতে যাবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর উপর বিশ্বাস রাখার অর্থ ঐ দ্বীনে তওহীদের উপর ঈমান রাখা। আর জান্নাতে প্রবেশের অর্থও ওটাই, যা উপরে উল্লেখ করা

হয়েছে যে, আমলনামার দাবী অনুযায়ী আল্লাহ্র অনুগ্রহে প্রথমেই (অর্থাৎ, বিনা শাস্তিতেই) অথবা গুনাহের কিছুটা শাস্তি ভোগ করার পর প্রত্যেক ঈমানদার জান্নাতে অবশ্যই যাবে।

(١٧) عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ (وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْاَنْصَارِ) اَنَّهٗ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَ اَنَا اُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ فَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِيْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُمْ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اٰتِيْ مَسْجِدَهُمْ فَاُصَلِّيْ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَأْتِيْنِيْ فَتُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ فَاَتَّخِذُهٗ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ عُتْبَانُ فَغَدَا عَلَيَّ وَ اَبُوْبَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَذِنْتُ لَهٗ فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاَشَرْتُ لَهٗ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلٰى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهٗ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ اَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْعَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ اَوْ ابْنُ الدُّخْشُنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَالِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ ذَاكَ اَلَاتَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّا نَرٰى وَجْهَهٗ وَ نَصِيْحَتَهٗ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ * (رواه البخارى و مسلم)

১৭। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনছারী সাহাবী হযরত ওতবান ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে। এদিকে আমি আমার কওমের ইমামত করি; কিন্তু বৃষ্টিপাত হলে আমার ও আমার কওমের মাঝখানে যে খালটি রয়েছে সেটি পানিতে উপচে পড়ে বইতে শুরু করে, আর আমি তখন তাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়াতে পারি না। তাই ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একান্ত বাসনা যে, আপনি আমার বাড়ীতে এসে নামায পড়ে যাবেন, আর আমি সেই স্থানটিকে নামাযের স্থান হিসাবে নির্ধারিত করে নেব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আমি তাই করব। বর্ণনাকারী ওতবান (রাঃ) বলেন, সকাল বেলা যখন সূর্য একটু উপরে উঠল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর (রাঃ) আমার এখানে পৌঁছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে আসার অনুমতি চাইলে আমি অনুমতি দিলাম। তিনি ঘরে এসে না বসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ অংশটি আমার নামায পড়ার জন্য তুমি পছন্দ

কর ? আমি তখন ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করলাম। সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করে দিলেন। আমরাও কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দুই রাকআত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। ওতবান (রাঃ) বলেন, এরপর আমরা তাঁকে 'খাযীরা' (এক জাতীয় সুস্বাদু খাবার) আহার করার জন্য আটকিয়ে ফেললাম, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছিলাম।

এদিকে তাঁর আগমনবার্তা শুনে মহল্লাবাসীদের মধ্য থেকেও কিছু লোক এসে সমবেত হল। তাদের মধ্য থেকেই একজন বলে উঠল, মালেক ইবনে দুখাইশিন (অথবা দুখশুন) কোথায় ? এ কথা শুনে তাদের মধ্য থেকেই অন্য একজন বলে ফেলল, সে তো মুনাফেক, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি তার ভালবাসাই নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথোপকথন শুনে বললেন ঃ এমন কথা বলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই লাভ করতে চায়। মন্তব্যকারী লোকটি তখন বলল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তবে আমরা তার মনোযোগ ও কল্যাণকামিতা মুনাফেকদের প্রতিই দেখি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আন্তরিকভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠকারীর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেওয়ার মর্ম উহাই, যা ইতিপূর্বেকার এ বিষয় সংক্রান্ত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। মুসলিম শরীফে এই হাদীসেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র স্থলে 'তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। তবে উভয় শিরোনামের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেওয়া এবং দ্বীন হিসাবে ইসলামকেই বরণ করে নেওয়া। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, নবীযুগে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামকেই দ্বীন হিসাবে অবলম্বন করে নেওয়ার জন্য সাধারণভাবে এ ভাষাই প্রয়োগ করা হত।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, যে সাহাবী মালেক ইবনে দুখশুনকে মুনাফেক বলেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিতেও মালেক ইবনে দুখশুনের মধ্যে মুনাফেক হওয়ার মত কোন পাপাচার ছিল না। তার মধ্যে কেবল এই কারণটিই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল যে, তিনি মুনাফেকদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন ও মেলামেশা করতেন।

এর দ্বারা একদিকে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী আবেগানুভূতির পরিমাপ করা যায় যে, তাঁরা এমন সামান্য ব্যাপারেও এতটুকু ক্ষুব্ধ হতেন এবং এটাকে মুনাফেকী মনে করতেন। অপর দিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরস্কার দ্বারা এ শিক্ষা লাভ হয় যে, যাদের মধ্যে এ জাতীয় কিছুটা দুর্বলতা থাকে; কিন্তু নিজেদের ঈমান এবং তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানে যদি তারা নিষ্ঠাবান হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে এই ধরনের কুধারণা পোষণ ও এমন কঠোর মন্তব্য করা জায়েয নয়; বরং এখানে ঈমানের দিকটাই অধিক লক্ষণীয় ও সম্মানযোগ্য বিবেচিত হবে।

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মালেক ইবনে দুখশুনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা ইসলামের জন্য পরিচালিত সাধারণ যুদ্ধসমূহে এমনকি বদরযুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাই এখানে মুনাফেকীর কুধারণার কোন অবকাশ নেই; বরং মুনাফেকদের সাথে সম্পর্ক রাখার পেছনে তাঁরও হয়ত হাতেব ইবনে আবী বালতা'আর মত বিশেষ কোন অপারগতা ছিল।

(١٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ فِىْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْطَأَ عَلَيْنَا وَ خَشِيْنَا اَنْ يُّقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَ فَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتَيْتُ حَائِطًا لِلْاَنْصَارِ لِبَنِى النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهٖ هَلْ اَجِدُ لَهٗ بَابًا فَلَمْ اَجِدْ فَاِذَا رَبِيْعٌ يَدْخُلُ فِىْ جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِيْرٍ خَارِجَةٍ (والرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ) قَالَ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ مَا شَانُكَ ؟ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَاَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِىْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَعْطَانِىْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيَكَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ، فَقَالَ مَاهَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِىْ بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرْتُهٗ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَخَرَرْتُ لِاِسْتِىْ فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكِبَنِىْ عُمَرُ وَاِذَا هُوَ عَلٰى اِثْرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهٗ بِالَّذِىْ بَعَثْتَنِىْ بِهٖ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاِسْتِىْ فَقَالَ ارْجِعْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَ اُمِّىْ اَبَعَثْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرَهٗ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَاِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ يَّتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ

(رواه مسلم) *

১৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসা ছিলাম।

হযরত আবূ বকর এবং ওমর (রাঃ)ও আমাদের সাথে ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখান হতে উঠে কোন এক দিকে চলে গেলেন। তারপর তাঁর ফিরে আসতে অনেক দেরী হচ্ছিল বলে আমরা শংকিত হয়ে পড়লাম যে, আমাদেরকে ছেড়ে গিয়ে একাকী অবস্থায় তিনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হলেন কি না। (অর্থাৎ, আমাদের অবর্তমানে তিনি কোন শত্রুর অনিষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন কি না।) এ চিন্তায় আমরা অস্থির হয়ে গেলাম এবং সবাই তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। সবার আগে আমিই অস্থির হয়ে তাঁর সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত আনসারদের বনূ নাজ্জার গোত্রের এক বাগানে এসে পৌঁছলাম। বাগানটি চার দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। আমি এখানে এসে চারদিকে ঘুরতে লাগলাম যে, ভিতরে যাওয়ার জন্য কোন রাস্তা পাই কি না। কিন্তু কোন রাস্তা খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম, ছোট্ট একটি নালা, যা বাইরের একটি কুঁয়া থেকে বাগানের ভিতর প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। (আবূ হুরায়রা বলেন,) আমি নিজেকে সঙ্কুচিত করে এই সরু নালা দিয়ে বাগানের ভিতর পৌঁছে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন ঃ আবূ হুরায়রা ? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ কিভাবে এখানে আসা হল ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের মাঝে ছিলেন, হঠাৎ করে সেখান থেকে উঠে আসলেন। তারপর যখন দেখলাম আপনার ফিরতে দেরী হচ্ছে, তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের থেকে পৃথক হয়ে একাকী আপনি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে গেলেন কি না। এই আশংকায় আমরা সবাই ঘাবড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর সবার আগে আমিই শংকিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি এ বাগানে এসে পৌঁছলাম, আর (ভিতরে প্রবেশের জন্য যখন কোন দরজা খুঁজে পেলাম না, তখন) শিয়ালের মত শরীর কুঁচকে এই সরু পথেই কোন রকমে এখানে ঢুকে পড়লাম। অন্যান্য লোকেরাও আমার পেছনে রয়েছে। এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পাদুকাদ্বয় আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ আমার এই জুতা দু'টি নিয়ে যাও এবং এ বাগান থেকে বের হবার পর এমন যে ব্যক্তির সাথেই তোমার সাক্ষাত হয়, যে আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য দেয়, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সেখান থেকে বের হয়ে সামনে রওয়ানা দিলাম। সর্বপ্রথম যার সাথে আমার সাক্ষাত হল তিনি ছিলেন হযরত ওমর। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ হুরায়রা! তোমার হাতে এ পাদুকাদ্বয়ের রহস্য কি ? আমি উত্তর দিলাম, এ দু'টি হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা মুবারক। আমাকে তিনি এগুলো দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, এমন যার সাথেই আমার সাক্ষাত হয়, যে আন্তরিকভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য প্রদান করে, আমি যেন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেই। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এই কথা শুনে ওমর (রাঃ) আমার বুকে হাত দ্বারা এমন জোরে আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর তিনি বললেন, পিছনের দিকে ফিরে যাও। আমি কাঁদতে কাঁদতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে আসলাম, আর ওমরও পেছনে পেছনে এসে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আবূ হুরায়রা! তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, ওমর (রাঃ)-এর সাথে আমার

সাক্ষাত হল। আপনি আমাকে যে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন আমি তাঁকে সেই সুসংবাদ শুনালাম. তখন তিনি আমার বুকের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। আর তিনি আমাকে এও বললেন যে, পেছনে ফিরে যাও। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ওমরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ওমর! তুমি এমনটি কেন করলে ? ওমর নিবেদন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন। আপনি কি আবূ হুরায়রাকে আপনার পাদুকাদ্বয় দিয়ে এ জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, সে এমন যার সাথেই সাক্ষাত করবে, যে আন্তরিকভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য দান করে, তাকেই যেন জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেয় ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিই তাকে একথা বলে পাঠিয়েছিলাম। ওমর বললেন, দয়া করে আপনি এরূপ করবেন না। কেননা, আমার আশংকা হয় যে, মানুষ একথা শুনে এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে (এবং আমল ও সাধনা থেকে উদাসীন হয়ে যাবে।) তাই তাদেরকে এভাবে আরো আমল করতে দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ আচ্ছা, তাদেরকে আমল করার জন্য ছেড়ে দাও। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যার দাবী রাখে ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে হযরত আবূ হুরায়রাকে নিজের পাদুকাদ্বয় কেন দিলেন ? হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ এর ব্যাখ্যায় যদিও বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু এসবের মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ এই মনে হয় যে, হযরত আবূ হুরায়রাকে তিনি যে মহা সুসংবাদের ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, এর সবিশেষ গুরুত্বের কারণে নিজের কোন বিশেষ স্মারকচিহ্ন তাঁর সাথে দেওয়া উপযোগী মনে করলেন। আর সে সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মত অন্য কোন জিনিস ছিল না। তাই তিনি নিজের পাদুকাদ্বয়ই আবূ হুরায়রার হাতে দিয়ে দিলেন।

(২) হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনায় হযরত আবূ হুরায়রার সাথে যে কঠোর ব্যবহার করলেন, এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য হযরত ওমরের ঐ বিশেষ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যা তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি (এবং হযরত আবূ বকরও) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কর্মকান্ডে অংশীদার তথ্যাভিজ্ঞ, বিশেষ উপদেষ্টা এবং বলতে গেলে তাঁর মন্ত্রী ও সহকারীর পর্যায়ে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও সাধারণভাবে তাঁর এ মর্যাদা ও অবস্থানের কথা জানতেন। আর যেভাবে প্রত্যেক দলের ও প্রত্যেক পরিবারের প্রধান ব্যক্তিটি তার ছোটদেরকে শাসন ও তিরস্কারের অধিকার সংরক্ষণ করে, এখানে হযরত ওমরও সে অধিকার রাখতেন। তিনি অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন বশতঃ এ অধিকার প্রয়োগও করতেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, ছোটদের সংশোধন ও তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বড়দের এই অধিকার মেনে নিতে হয়। তাই হযরত ওমর (রাঃ) এ ঘটনায় আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে যে কঠোর আচরণ করেছেন, এটা এ ধরনের ব্যাপারই ছিল। আর এমনটাও বুঝা যায় যে, হযরত ওমর প্রথমে হয়তো তাঁকে ফিরে যেতে বলেছিলেন; কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা যেহেতু সকল ঈমানদারদের জন্য একটি মহা সুসংবাদ নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এটাকে নিজের জন্য তিনি বিরাট সৌভাগ্য মনে করছিলেন, তাই তিনি ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। শেষে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করার জন্য এ

কঠোর ব্যবহার ও বলপ্রয়োগ করলেন। কেননা, নবুওয়াতের পদমর্যাদা ও নবীর বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকার দরুন তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এই ব্যাপক সুসংবাদের ক্ষতিকর দিকটি যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসবে, তখন তিনিও এটাকে অনুপযোগীই মনে করবেন এবং আবূ হুরায়রাকে এর ব্যাপক প্রচার থেকে নিষেধ করে দেবেন। বস্তুতঃ শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল।

এখানে এ কথাটিও স্মরণ রাখা চাই যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আয (রাঃ)-কেও এমন সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। (এ হাদীসটি ১৩নং ক্রমিকে ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।) তখন মো'আয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন যে, আমি এ সুসংবাদটি সকল মুসলমানকে শুনিয়ে দেই; কিন্তু তিনি এর অনুমতি দিলেন না। অনুমতি না দেওয়ার কারণ হিসাবে তিনি একথাই বলেছিলেন যে, মানুষ একথা শুনে এর উপরেই ভরসা করতে থাকবে এবং দ্বীনী উন্নতি থেকে পেছনে পড়ে যাবে।

(৩) এই হাদীসেও কেবল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দানের উপর জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এর একটি সাধারণ ব্যাখ্যা তো তাই, যা উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এ হাদীসের শব্দমালায় এই সম্ভাবনারও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর অর্থ শুধু এই যে, যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র সাক্ষ্য দান করবে অর্থাৎ খাঁটি অন্তরে দ্বীনে তওহীদ তথা ইসলামকে গ্রহণ করে নেবে, তাকে অবশ্যই এ সুসংবাদ দেওয়া হবে যে, সে নিশ্চয় জান্নাতে যাবে, যদিও গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পরই যাক না কেন। এ অর্থ গ্রহণ করলে কোন প্রশ্ন থাকে না।

এতদ্ভিন্ন এখানে আরেকটি সূক্ষ্মতত্ত্ব উল্লেখ করার মত রয়েছে যে, মহান আল্লাহ্র দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের উপর অনেক সময় আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা, তাঁর অনন্ত মহিমা, তাঁর ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষমতার বিষয়টি যখন ফুটে উঠে, তখন তাঁদের উপর আতংক ও ভীতির ভাব প্রবল হয়ে উঠে। এ সময় তাদের অনুভূতি এই থাকে যে, হয় তো কোন নাফরমান বান্দাই আর মুক্তি পেতে পারবে না। আর এ বিশেষ অবস্থায় তাদের বক্তব্য এমন হয়ে থাকে যে, যে ব্যক্তি এ পাপে লিপ্ত হবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না, যে ব্যক্তি এই গুনাহ করবে, জান্নাতের বাতাসও তার গায়ে লাগবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অন্য কোন সময় যখন তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম দয়া ও রহ্মত এবং তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অনুকম্পার বিষয়টি উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন তাদের উপর আশা এবং আল্লাহ্র রহ্মতের দিকটি প্রবল হয়ে যায় এবং এ জগতে তাদের হৃদয়ানুভূতি এই হয়ে থাকে যে, যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণও কল্যাণের বস্তু আছে, তাকে ক্ষমাই করে দেওয়া হবে। আর এ ধরনের অবস্থাতেই তাদের মন থেকে এ প্রকার সুসংবাদবাণী বের হয়ে থাকে। এ সূক্ষ্মতত্ত্বটিই শেখ সাদী সিরাজী (রহঃ) এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ আল্লাহ্র শান তো হচ্ছে এই যে, তিনি যদি প্রবল প্রতাপের সাথে তাঁর নির্দেশের তরবারী চালিয়ে দেন, তাহলে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও নির্বাক ও বধির হয়ে থাকবে। আর যদি নিজের অনুগ্রহ বিতরণের ঘোষণা দিয়ে দেন, তাহলে আযাযীল শয়তানও আশান্বিত হয়ে বলে উঠবে যে, হয়ত আমিও এ করুণার একটি অংশ পেয়ে যাব।

অতএব, উপরে উল্লেখিত হাদীসের ব্যাপারে এটাও খুবই যুক্তিযুক্ত যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) যখন বনূ নাজ্জারের ঐ বাগানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমতের দরিয়া ও তাঁর অপার অনুগ্রহের দ্যুতির কল্পনা ও পর্যবেক্ষণে নিমগ্ন ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি হযরত আবূ হুরায়রাকে প্রমাণ হিসাবে নিজের পাদুকা মুবারক দিয়ে তওহীদের সাক্ষ্য দানকারী প্রতিটি মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) যেহেতু এই বিষয়টির স্বরূপ এবং এসব অবস্থার উৎরাই চড়াই সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাই তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা ও তদন্ত না করা পর্যন্ত আবূ হুরায়রাকে বিষয়টির ঘোষণা দিতে বারণ করে থাকবেন। অন্যরূপে কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, এ সময় হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের এ বিশেষ ভাব (অর্থাৎ, দয়া ও আশার প্রাবল্য) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উদঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি নিজের ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এ কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন যে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এ অবস্থার প্রাবল্য থাকবে না এবং এ ঘোষণার অন্য দিকটি যখন তাঁর সামনে তুলে ধরা হবে, তখন তিনি নিজেই এটা নিষেধ করে দেবেন। যেমন, বাস্তবে তাই হয়েছিল। এ ধরনের নাজুক ক্ষেত্রে সঠিক বিষয়ের উপলব্ধি ও বাস্তবতার অনুধাবন হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। হাদীস শরীফে এ বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত ওমরকে 'মুহাদ্দাস' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আরেকটি মৌলিক কথা, যার দ্বারা এ ধরনের অনেক হাদীসে উত্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তির নিরসন হয়ে যায়

এই ধরনের আয়াত ও হাদীসের উপর চিন্তা-গবেষণা করার সময় একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে এটাও মনে রাখার মত যে, এই ধরনের সুসংবাদে বক্তার উদ্দেশ্য ও দৃষ্টি থাকে কোন ভাল কাজের নিজস্ব গুণ এবং তার প্রকৃত প্রভাব ও ফলাফল বাতলে দেওয়া। সেখানে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না যে, অন্য কোন কাজের দাবী যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে পরে পরিণাম কি হবে। আর এটা ঠিক এমনই, যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তকসমূহে এ নীতির ভিত্তিতেই ঔষধের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেমন, লেখা থাকে, যে ব্যক্তি ত্রিফলা ব্যবহার করবে সে সর্বদা সর্দি থেকে নিরাপদ থাকবে। এর দ্বারা কেউ যদি এ কথা বুঝে নেয় যে, কেউ যদি ত্রিফলা খাওয়ার সাথে সাথে চর্বি, টক ইত্যাদি সর্দি উৎপাদক জিনিসগুলোও সব সময় খেতে থাকে, তাহলেও তার কখনো সর্দি হবে না, তবে এটা চরম নির্বুদ্ধিতা ও চিকিৎসকদের কথার মর্ম উপলব্ধি না করারই প্রমাণ হবে।

এ মূলনীতির আলোকে এই ধরনের হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকুই যে, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের নিজস্ব দাবী এটাই যে, এর দ্বারা মানুষ জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং জান্নাতে যাবে। কিন্তু সে যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কিছু খারাপ আমলও করে থাকে, যেগুলোর নিজস্ব দাবী শাস্তি পাওয়া এবং জাহান্নামে যাওয়া বলে কুরআনে বলা হয়েছে, তাহলে এগুলোও তার নিজস্ব কিছু না কিছু প্রভাব দেখিয়েই ছাড়বে। এই ছোট তত্ত্ব কথাটি স্মরণে রাখলে সুসংবাদ ও সতর্কবাণী এবং উৎসাহদান ও ভয় প্রদর্শন সম্পর্কীয় শত শত হাদীসের বেলায় মানুষের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি এবং এর কারণে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, ইনশাআল্লাহ তা আর থাকবে না।

(١٩) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً ★

(رواه البخارى و مسلم واللفظ له)

১৯। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নাম থেকে ঐ ধরনের সকল মানুষকেই বের করে আনা হবে, যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছিল এবং তাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ পুণ্যও ছিল। তারপর ঐ সব লোকদেরকেও বের করে আনা হবে, যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছিল এবং তাদের অন্তরে গমের দানার সমান পুণ্যও ছিল। তারপর ঐসব লোকেদেরকেও বের করে আনা হবে, যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে ছিল এবং তাদের অন্তরে অণু পরিমাণ পুণ্যও ছিল। —বুখারী, মুসলিম

পূর্বে উল্লেখিত অনেক হাদীসের ব্যাখ্যায় যেমন বিস্তারিতভাবে এবং প্রামাণ্যরূপে লিখা হয়েছে, তেমনিভাবে এ হাদীসেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা দ্বারা ইসলাম কবুল করা এবং এর স্বীকৃতি প্রদান করাই উদ্দেশ্য। এর ভিত্তিতে হাদীসের মর্ম এটাই হয় যে, যেসব মানুষ ইসলামের কালেমা পাঠ করে এবং নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত রাখে, আর তাদের অন্তরে অণু পরিমাণ পুণ্য (অর্থাৎ, ঈমানের আলো) থাকে, তারাও শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসবে। এ হাদীসে তিনটি স্থানে 'খায়র' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অনুবাদ আমরা 'পুণ্য' শব্দ দিয়ে করেছি। কিন্তু হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসেরই অন্য এক রেওয়ায়তে (যেটি ইমাম বুখারীও উল্লেখ করেছেন) 'খায়র' শব্দের স্থলে 'ঈমান' শব্দও এসেছে, যা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, এখানে পুণ্য দ্বারা ঈমানের আলোই উদ্দেশ্য।

এ হাদীস দ্বারা হকপন্থীদের দু'টি বিশেষ ও সর্বসম্মত এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ আকীদার কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায়। প্রথম বিষয়টি এই যে, অনেক কালেমা পাঠকারী লোক নিজেদের বদ আমলের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, তাদের অন্তরে যদি হাল্কা এবং দুর্বল এমনকি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী অণু পরিমাণ ঈমানও থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। এটা হতে পারে না যে, কোন অতি নিম্ন স্তরের ঈমানদারও কাফের মুশরিকদের মত চিরকাল জাহান্নামে পড়ে থাকবে, তারা আমলের বিবেচনায় যত বড় ফাসেক ও পাপাচারীই হোক না কেন।

এ বিষয়ের অনেক হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফেই হযরত আনাস (রাঃ) ছাড়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, হযরত জাবের এবং হযরত আবূ হুরায়রা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এ বিষয়বস্তুটি উল্লেখিত সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া হযরত আবূ বকর, হযরত আবূ মূসা প্রমুখ অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, হাদীস বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং উলূমুল হাদীসে পারদর্শী লোকদের নিকট এ বিষয়টি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সন্দেহাতীত ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত; বরং বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর যে বিস্তারিত বর্ণনাটি পাওয়া যায়, সেখানে স্পষ্টভাবে এ কথারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যেসব

পাপী মুসলমান জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত মুমিনরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে খুবই অনুনয় বিনয়ের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা জানাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই অনুরোধ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাদেরকেই অনুমতি দিয়ে বলবেন ঃ যাও, তোমরা যার মধ্যে এক দীনার পরিমাণও কল্যাণ দেখ তাকেই বের করে নিয়ে আস। ফলে এ ধরনের প্রচুর সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে। তারপর আবার তাদেরকে বলা হবে, এবার গিয়ে দেখ, যাদের মধ্যে অর্ধ দীনার কল্যাণেরও সন্ধান পাও তাদেকেও বের করে নিয়ে আস। এর ফলে এ ধরনের প্রচুর সংখ্যক লোককে বের করে নিয়ে আসা হবে। তারপর আবার হুকুম হবে যে, যাও, এমন লোকদেরকেও বের করে নিয়ে আস, যাদের মধ্যে অণু পরিমাণ কল্যাণও তোমরা দেখতে পাও। এর ফলে এমন স্তরের অনেক লোককে বের করে আনা হবে। পরিশেষে এই সুপারিশকারীরাই নিবেদন করবে ঃ হে প্রতিপালক! আমরা জাহান্নামে এমন কাউকে আর ছেড়ে আসিনি, যার অন্তরে কিছুটা কল্যাণ (তথা ঈমানের নূর) আছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ ফেরেশতারাও সুপারিশ করেছে, নবীরাও সুপারিশ করেছে এবং মুমিনরাও সুপারিশ করেছে। এখন কেবল পরম দয়াময় (আল্লাহ্ তা'আলা)-এর পালাই অবশিষ্ট। এই বলে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহ্মত ও ক্ষমার হাতে এমন লোকদেরকেও বের করে নিয়ে আসবেন, যারা কখনো কোন নেক আমলই করেনি। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর এ হাদীসের শেষে ঐসব লোকদের ব্যাপারে একথাটিও রয়েছে ঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোক। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে কোন আমল ও কল্যাণের বিনিময় ছাড়াই জান্নাতে দাখিল করবেন।

এরা হবে ঐসব লোক, যাদের কাছে খুবই দুর্বল ও ক্ষীণ ঈমান ছাড়া নেক আমল ও পুণ্যের কোন পুঁজিই থাকবে না; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শেষ পর্যন্ত নিজ দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করে দিবেন।

এ মাসআলা ও প্রসঙ্গটি নিয়ে ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে 'মুরজিয়া' এবং 'খারেজী' উভয় সম্প্রদায় বিভ্রান্তিতে পড়ে গিয়েছিল। (মুরজিয়ারা বলত, মুমিন হওয়ার জন্য কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট, আমলের কোন প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে খারেজীরা বলত যে, আমল ছেড়ে দিলে মানুষ মুমিনই থাকে না; বরং কাফের হয়ে যায়।) বর্তমানেও কোন কোন মহলের প্রবণতা মুরজিয়াদের মত মনে হয়, আবার অন্য মহলের ঝোঁক খারেজীদের মতবাদের প্রতি লক্ষ্য করা যায়। এই জন্যই আমরা হাদীসের মূল ব্যাখ্যার বাইরে এ কয়টি লাইন লিখা জরুরী মনে করেছি।

ইসলাম গ্রহণের দ্বারা অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়

(২০) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ فِىْ قَلْبِىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلَاُبَايِعُكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهٗ فَقَبَضْتُ يَدِىْ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُو قُلْتُ اَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قُلْتُ اَنْ يُّغْفَرَلِىْ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَ اَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهٗ * (رواه مسلم)

২০। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম, আপনার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করব। তিনি তখন নিজের ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলেন; কিন্তু আমি আমার হাত ফিরিয়ে নিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আমর! তোমার কি হল ? (অর্থাৎ, তুমি তোমার হাত কেন ফিরিয়ে নিলে ?) আমি নিবেদন করলাম, আমি একটি শর্ত লাগাতে চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি কি শর্ত আরোপ করতে চাও ? আমি আরয করলাম, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ হে আমর! তোমার কি একথা জানা নেই যে, ইসলামগ্রহণ পূর্ববর্তী সকল গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়, হিজরতও পূর্ববর্তী গুনাহসমূহকে শেষ করে দেয় এবং হজ্জও পূর্ববর্তী গুনাহসমূহকে দূর করে দেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহমাফীর ক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া হিজরত এবং হজ্জের প্রভাবের কথা এই স্থানে এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলেছেন যে, ইসলাম তো ইসলামই; এর কোন কোন আমলের মধ্যেও গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেওয়ার শক্তি রয়েছে। তবে এখানে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ (১) ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত অথবা হজ্জ করার এই প্রভাব ঐ অবস্থায় প্রতিফলিত হবে, যখন এ কাজগুলো খাঁটি নিয়্যতে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হবে। (২) শরীঅতের দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা স্বস্থানে স্বীকৃত যে, কারো জিম্মায় যদি আল্লাহ্র বান্দাদের কোন হক থাকে, বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত হক থাকে, তাহলে ইসলাম গ্রহণ অথবা হিজরত কিংবা হজ্জের দ্বারা এ হক মাফ হবে না। এ ব্যাপারটি পাওনাদারদের নিকট থেকে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

কুফর ও শিরকের জীবন থেকে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলে যে অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, এর প্রতিশ্রুতি কুরআন শরীফেও দেওয়া আছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ হে রাসূল! আপনি ঐসব লোকদের বলে দিন, যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তারা যদি (কুফরী থেকে) ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সূরা আনফাল)

(٢١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ اَلْخُدْرِىْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهٗ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَالِكَ الْقِصَاصُ اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِأَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلَّا اَنْ يَّتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا * (رواه البخارى)

২১। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং তার এই ইসলাম সুন্দর হয়, তখন ইতিপূর্বে সে যেসব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম গ্রহণের বরকতে সেগুলো ক্ষমা করে দেন। তারপর তার ভাল-মন্দের হিসাব এই থাকে যে, একটি পুণ্যের উপর দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত সওয়াব লিখা হয়, আর মন্দ কাজ করলে সে

কেবল ঐ একটি মন্দ কাজের শাস্তির উপযুক্ত হয়। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যদি এটাও ক্ষমা করে দেন (তাহলে দিতে পারেন।)। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্র দ্বীন (ইসলাম)কে নিজের দ্বীন বানিয়ে নিলে এবং মুসলমান হয়ে গেলে যে অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়, এর জন্য শর্ত হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যও যেন তার জীবনে এসে যায়। (অর্থাৎ, তার অন্তর ও অভ্যন্তর ইসলামের আলোতে আলোকিত এবং দেহ ও কাঠামো আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও গোলামীতে যেন সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে যায়।) হাদীসে উল্লেখিত "তার ইসলাম যদি সুন্দর হয়ে যায়" কথার মর্ম এটাই।

অতএব, কারো জীবন যদি ইসলাম গ্রহণের পরও ইসলামের আলো ও সৌন্দর্য থেকে শূন্য থেকে যায় এবং তার অন্তর ও বাহিরে ইসলামের রূপ প্রতিফলিত না হয়, তাহলে পেছনের সকল গুনাহ মাফীর ঘোষণা তার বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

অনুরূপভাবে একথাও এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, একটি পুণ্যের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শ' গুণ পর্যন্ত প্রদানের পুরস্কারমূলক বিধানটিও ঐসব বান্দাদের জন্য যারা ইসলামের কিছুটা শোভা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে নিতে পেরেছে। আর এই শোভা ও সৌন্দর্যের কমবেশীর হিসাবেই পুণ্যের প্রতিদানও দশগুণ থেকে সাত শ' গুণ পর্যন্ত উঠানামা করে।

ঈমান গ্রহণ করার পর মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যায়

(٢٢) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهٗ وَ نَفْسَهٗ اِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ * (رواه البخارى ومسلم)

২২। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এ বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখব, যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে। তারপর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলল, সে নিজের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিল, তবে ইসলামেরই কোন আইন অনুসারে যদি (তার নিরাপত্তায়) হস্তক্ষেপ করতে হয়। আর তার হিসাব-নিকাশের ভার আল্লাহ্ তা'আলার উপর। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কয়েকটি গোত্র যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিয়ে হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক এই হাদীসটি বর্ণিত হয়।

এ হাদীসেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার অর্থ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেওয়া। পূর্বের হাদীসসমূহে যেরূপ ইসলাম গ্রহণের পরকালীন ফল জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভ উল্লেখ করা হয়েছে, তদ্রূপ এ হাদীসে ইসলাম গ্রহণের একটি পার্থিব ও আইনগত উপকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর দ্বারা মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যায়। তাছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে একটি

অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির ঘোষণা দিয়েছেন। ঘোষণাটি এই যে, আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য এ ছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্য ও বন্দেগীর পথে নিয়ে আসা হবে এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। অতএব, যে কেউ আল্লাহ্‌র দ্বীনকে গ্রহণ করে নেবে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই নির্ধারিত জীবনধারা তথা ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেবে, তার জীবন ও সম্পদ আমাদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

"তবে ইসলামেরই কোন আইনে যদি হস্তক্ষেপ করা হয়" কথাটির মর্ম এই যে, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করার পর এমন কোন অপরাধে লিপ্ত হয়, যার কারণে স্বয়ং আল্লাহ্‌র আইনেই তাকে শারীরিক অথবা আর্থিক কোন শাস্তি দিতে হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার কারণে এবং মুসলমান হওয়ার কারণে সে এই আইনগত শাস্তি ও দন্ড থেকে রেহাই পাবে না।

"তার হিসাব-নিকাশের ভার থাকবে আল্লাহ্‌র উপর" একথাটির মর্ম হল, যে ব্যক্তি ইসলামের কালেমা পাঠ করে তার ঈমান গ্রহণের বিষয়টি আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবে, আমরা তাকে মু'মিন এবং মুসলমান স্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দেব এবং তার সাথে মু'মিন মুসলমানের মতই ব্যবহার করব, কিন্তু বাস্তবে যদি তার নিয়্যতে কোন গোলমাল থাকে এবং তার অন্তরে কোন কৃত্রিমতা থাকে, তাহলে এর হিসাব নেওয়ার ভার আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি যেহেতু আলেমুল গায়েব এবং অন্তর্যামী, তাই তিনিই তার হিসাব বুঝে নেবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি প্রায় একই শব্দমালায় মুসলিম শরীফে হযরত জাবের এবং তারেক আশজায়ী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। অপর কয়েকজন সাহাবী এ বিষয়বস্তুটি কিছুটা বিস্তারিতভাবেও বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা এ হাদীসের বিষয়বস্তুটি আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। আমরা এগুলো থেকে কয়েকটি রেওয়ায়াত এখানে উল্লেখ করছি।

(٢٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوْا بِىْ وَبِمَا جِئْتُ بِهٖ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ * (رواه مسلم)

২৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখি, যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য দেয় এবং আমার প্রতি এবং আমি যে হেদায়াত নিয়ে এসেছি এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেয়। অতএব, যখন তারা এমনটি করে নেবে, তখন তারা নিজেদের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিতে পারবে। তবে ইসলামেরই কোন আইন ও অধিকারের কারণে যদি তা ক্ষুণ্ন হয়। আর তাদের হিসাব থাকবে আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যদান ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত ও রেসালতের উপর এবং তাঁর আনীত দ্বীনের উপর ঈমান আনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও এ বিষয়ের একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, এর আগের হাদীসে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ পূর্ণ দ্বীন-ইসলামকেই গ্রহণ করে নেওয়া।

(٢٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ * (رواه البخارى ومسلم)

২৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এ বিষয়ে নির্দেশপ্রাপ্ত যে, মানুষের সাথে আমি যেন সে পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাই, যে পর্যন্ত না তারা এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল এবং যে পর্যন্ত না তারা নামায কায়েম করতে শুরু করে ও যাকাত প্রদান করতে শুরু করে। তারপর তারা যখন এসব করতে শুরু করবে, তখন তারা নিজেদের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিতে পারবে, তবে ইসলামের কোন হক ও অধিকারের কারণে। আর তাদের হিসাব-নিকাশ থাকবে আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের সাথে সাথে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি বিধানের উল্লেখও কেবল উদাহরণ ও লক্ষণ হিসাবে করা হয়েছে। অন্যথায় এখানেও উদ্দেশ্য এটাই যে, আল্লাহ্র দ্বীনের উপর ঈমান নিয়ে আসবে এবং ইসলামের দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেবে। এ বিষয়টি হযরত আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত উপরের হাদীসে "আমার উপর এবং আমার আনীত হেদায়াতের উপর ঈমান নিয়ে আসবে" এ সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দমালায় বুঝানো হয়েছে।

(٢٥) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا وَصَلَّوْا صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَائُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ * (رواه البخارى)

২৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এ বিষয়ে নির্দেশপ্রাপ্ত যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখি, যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র স্বীকৃতি দান করে। অতএব, তারা যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র প্রবক্তা হয়ে যাবে, আমাদের মতই নামায আদায় করবে, আমাদের কেবলার অনুসরণ করবে এবং আমাদের যবেহকৃত পশু খাবে, তখন তাদের শোণিত ও তাদের সম্পদ আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে, তবে ইসলামের কোন অধিকারের কারণে যদি ব্যতিক্রম হয়। আর তাদের হিসাব-নিকাশের ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তওহীদের সাক্ষ্যদানের সাথে নামায পড়া, নামাযে ইসলামের কেবলার অভিমুখী হওয়া এবং মুসলমানদের যবেহকৃত পশু খাওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এ জিনিসগুলোর উল্লেখও কেবল আলামত ও নিদর্শন হিসাবেই করা হয়েছে। এ হাদীসেরও প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহের মত কেবল এতটুকুই যে, আমার যুদ্ধ যার সাথেই হোক না কেন, এটা কেবল দ্বীনের খাতিরে এবং মানুষকে কুফর ও শিরকের ভ্রষ্টতা থেকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনার জন্যই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই যে সব লোক ভ্রান্তপথ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্ প্রদর্শিত সরল পথ অবলম্বন করে নেবে এবং সত্য দ্বীন তথা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে, তাদের জীবন ও সম্পদে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা আমাদের জন্য হারাম। যেহেতু ঐ যুগ এবং ঐ পরিবেশে ঈমান ও ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন এগুলোই ছিল যে, মানুষ মুসলমানদের পদ্ধতি অনুযায়ী নামায পড়তে শুরু করবে, নামাযে কা'বা অভিমুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং মুসলমানদের যবেহকৃত পশু খাওয়া বর্জন করবে না, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদর্শন হিসাবেই এই বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছেন।

আবূ দাউদ শরীফে এ হাদীসেরই রেওয়ায়াতে "তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে" এর স্থলে এ শব্দমালা রয়েছে ঃ "মুসলমানদের যেসব অধিকার রয়েছে, সেসব অধিকার তাদের জন্যও সংরক্ষিত থাকবে এবং মুসলমানদের উপর যা কিছু বর্তায় তাদের উপরও তাই বর্তাবে।" যার মর্ম এই যে, যেসব লোক ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে তাদের বিরুদ্ধে কেবল আমাদের যুদ্ধাভিযান খতম হয়ে যাবে এবং তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে, তাই নয়; বরং তারা সকল অধিকার লাভে ও দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ আমাদের সমান হয়ে যাবে।

এ হাদীসসমূহের ব্যাপারে একটি সন্দেহ ও এর উত্তর

এ হাদীসসমূহের উপর স্থূল দৃষ্টিতে একটি প্রশ্ন জাগে। কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যাতা নিজেই এ প্রশ্নটি উত্থাপন করে এর বিভিন্ন উত্তরও দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, ইসলামে 'জিযিয়া' এবং উপযুক্ত শর্তের সাথে সন্ধি-চুক্তির নীতিও স্বীকৃত এবং এ দুই পন্থায়ও যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এ হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, যুদ্ধবিরতি কেবল তখনই হতে পারে, যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নেবে।

অধম সংকলকের নিকট এর উত্তর হচ্ছে এই যে, এসব হাদীসের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু যুদ্ধ বিরতি ও যুদ্ধ খতম করে দেওয়ার পন্থা বাতলানো নয়; বরং এ সব বক্তব্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসল উদ্দেশ্য কেবল দু'টি বিষয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। প্রথম বিষয়টি এই যে, আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, মানুষ আল্লাহ্রই এবাদত করবে এবং তাঁরই নির্ধারিত সরল পথে চলবে অর্থাৎ, ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, যারা এই দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেবে, আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকবে; বরং অধিকার ও দায়িত্বের বেলায় তারা অন্যান্য মুসলমানদের সম্পূর্ণ সমান বিবেচিত হবে।

এখন জিযিয়া এবং বিশেষ অবস্থায় বিশেষ শর্তের সাথে সন্ধিচুক্তি প্রসঙ্গে আসা যাক। বস্তুতঃ এগুলো যদিও যুদ্ধবিরতির পন্থার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, এটা ইসলামী

যুদ্ধের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং যেহেতু এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ, ইসলামের দাওয়াতের জন্য নিরাপদ রাস্তা খুলে যায়, তাই এর উপরও যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়ে যায়।

ঈমান ও ইসলামের কয়েকটি বাহ্যিক নিদর্শন

(٢٦) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَ ذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ * (رواه البخارى)

২৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেউ আমাদের মত নামায পড়বে, আমাদের কেবলার অভিমুখী হবে এবং আমাদের যবেহকৃত পশুর গোশ্ত খাবে, সে-ই হবে ঐ মুসলিম যার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা রয়েছে। অতএব, তোমরা তার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করো না। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির উদ্দেশ্য বুঝার জন্য এই বাস্তব বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে যখন ইসলামী দাওয়াত কার্যক্রম পূর্ণ শক্তি ও প্রতাপসহ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন এমন অনেক ঘটনাই সামনে আসত যে, কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে নিত, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় তাদের ব্যাপারে এ সন্দেহের অবকাশ রয়ে যেত যে, তারা হয়তো প্রকৃতভাবে এবং অন্তর দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের সম্পর্ক কেবল এ ধরনের মানুষের সাথেই এবং তিনি এ বক্তব্য দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে এই বুঝাতে চান যে, যার মধ্যে তোমরা ইসলাম গ্রহণের এই বাহ্যিক নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ করবে যে, ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়ে, নামাযে মুসলমানদের কেবলাকে অনুসরণ করে এবং মুসলমানদের যবেহকৃত পশুর গোশ্ত খায়, তখন তাকে মুসলমানই মনে করে নাও এবং তার জীবন ও সম্পদকে আল্লাহ্ কর্তৃক নিরাপদ মনে করে নাও। অর্থাৎ, অহেতুক এ ধরনের কুধারণার ভিত্তিতে যে, তার অন্তরে ইসলাম নেই; বরং মুনাফেকী ভাব নিয়ে সে ইসলামী প্রতীক ও নিদর্শনসমূহ অবলম্বন করে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে যেয়ো না। মোটকথা, এ হাদীসের উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া।

অতএব, কিছু লোক যে এই হাদীসের এই মর্ম আবিষ্কার করে যে, যার মধ্যে ইসলামের এই প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ থাকবে, (অর্থাৎ, নামায পড়া, কেবলা অভিমুখী হওয়া এবং মুসলমানদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া,) তার মধ্যে ইসলামবিরোধী যত বিশ্বাস ও চিন্তাধারাই থাকুক না কেন এবং সে কাফের ও মুশরিকসুলভ যত কর্মকান্ডেই লিপ্ত হোক না কেন, সর্বাবস্থায় সে মুসলমানই থাকবে, এটা হাদীসটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মারাত্মক গোমরাহীর পরিচায়ক।

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের লোকদের সাথে এ হাদীসের কোন সম্পর্কই নেই। আর এমন লোকদেরকে মুসলমান হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ তো এই হবে যে, ইসলাম কেবল

এইসব বাহ্যিক কর্মকাণ্ড ও নিদর্শনসমূহের নাম। ঈমান ও বিশ্বাসের এতে কোন গুরুত্ব নেই। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, ইসলামের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করার চাইতে চরম মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা আর কিছুই হতে পারে না।

কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে মুসলমান কাফের হয়ে যায় না

(٢٧) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَّلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِيَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهٗ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ * (رواه ابوداؤد)

২৭। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় ইসলামের মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) যে ব্যক্তি কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে নিয়েছে, তার ব্যাপারে মুখ সংযত রাখা, অর্থাৎ, কোন গুনাহের কারণে তাঁকে কাফের বলা যাবে না এবং কোন অপকর্মের দরুন তাঁকে ইসলাম থেকে খারিজ মনে করা যাবে না। (২) জেহাদ সেদিন থেকেই অব্যাহত, যেদিন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবুওয়ত দিয়ে পাঠিয়েছেন, আর তা এ উম্মতের শেষ লোকদের দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, কোন জালেমের অবিচার বা ন্যায়বিচারকের সুবিচার তা বাতিল করতে পারবে না। (৩) তকদীরের প্রতি বিশ্বাস। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তিনটি জিনিসকে ঈমানের মৌলিক বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম এই যে, কোন গুনাহ ও অপকর্মের দরুন এমন কোন ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না এবং তাকে ইসলাম থেকে খারিজ মনে করা যাবে না, যে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'তে বিশ্বাসী।

এ ব্যাপারে একটি কথা তো এই মনে রাখতে হবে যে, কালেমায় বিশ্বাসী হওয়ার মর্ম উহাই, যা পূর্বে বার বার বলা হয়েছে। অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনি দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাওয়া। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কালেমা পাঠ করার অর্থ ছিল ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়া। স্বয়ং আমাদের ভাষার বাকপদ্ধতি অনুযায়ীও কালেমা পড়ার অর্থ ইসলাম গ্রহণ করাই বুঝায়।

এখানে আরেকটি কথা লক্ষণীয় যে, এ হাদীসে কোন গুনাহের কারণে কালেমায় বিশ্বাসী কোন মানুষকে কাফের বলতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন নিজের এ বাণীর দ্বারা উম্মতকে ঐ ভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন, যে গোমরাহীতে মু'তাযেলা ও খারেজীরা লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা কেবল গুনাহ ও অপকর্মের দরুন কাউকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে মনে করত। আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতবাদ এ হাদীস অনুসারে এটাই যে, কোন মুসলমান কেবল নিজের মন্দ আমল ও গুনাহের কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না এবং কাফের হয়ে যায় না।

যাহোক, হাদীসের এ অংশটির দাবী ও মর্ম এই যে, যখন কোন ব্যক্তি কালেমা পাঠ করে ঈমান নিয়ে আসল এবং ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নিল, তখন তার পক্ষ থেকে যদি কোন গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়ে যায় এবং তাকে অপকর্মে লিপ্ত দেখা যায়, তবে তাকে কেবল এই মন্দ কাজের কারণে কাফের ও ইসলাম থেকে খারিজ সাব্যস্ত করা যাবে না। অতএব, ঐসব লোকের সাথে এ হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই, যারা ইসলামের এমন কোন বিষয়কে অস্বীকার করে নিজেরাই ইসলামের সীমানা থেকে বাইরে চলে যায়, যার উপর ঈমান আনা মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত।

মনে করুন, এমন ব্যক্তি, যে কালেমা পাঠ করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, কিন্তু কুরআন শরীফ যে আল্লাহ্র কিতাব এ কথা সে অস্বীকার করে অথবা কেয়ামত এবং আখেরাতকে বিশ্বাস করে না অথবা খোদায়ী দাবী করে কিংবা নবুওয়াতের দাবী করে, তাহলে এ কথা পরিষ্কার যে, সে মুসলমান থাকবে না। তাকে অবশ্যই কাফের ও ইসলাম থেকে খারিজ বলে গণ্য করা হবে, কিন্তু তাকে এই কাফের বলা কোন মন্দ কাজ ও পাপাচারের কারণে নয়; বরং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে অস্বীকার করার কারণে বলা হবে। তাই এ দুই অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অনেক মানুষ এ পার্থক্যটির প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে এ হাদীসটির অপপ্রয়োগ করে থাকে।

এ হাদীসে জেহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমার নবুওয়াত লাভের যুগ থেকে শুরু করে এ জেহাদ সে পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যখন আমার উম্মতের শেষ দিকের লোকেরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে। কোন জালিমের অবিচার এবং কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের সুবিচার এটা রহিত করতে পারবে না। এ শেষোক্ত কথাটির মর্ম এই যে, যদি কোন সময় মুসলমানদের রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যবস্থাপনা কোন অযোগ্য হাতে পড়ে যায় এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার অযোগ্য ও জালেমও হয়, তাহলেও জেহাদ বাদ দেওয়া যাবে না এবং কারো জন্য এ আপত্তি করা ঠিক হবে না যে, আমরা এ অযোগ্য শাসকের অধীনে জেহাদ করব না। রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসনভার ভাল মানুষের হাতেই থাকুক আর মন্দ লোকের হাতেই থাকুক উভয় অবস্থায় তাদের অধীনে জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

দ্বীন ও ঈমানের বিভাগ ও এর শাখাসমূহ

(٢٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ * (رواه البخارى ومسلم)

২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম শাখাটি হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা, অর্থাৎ তওহীদের সাক্ষ্যদান করা, আর সর্বনিম্নটি হচ্ছে রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ঈমানের শাখাসমূহের জন্য যে 'সত্তরের কিছু উপরে' সংখ্যাটি ব্যবহার করা হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন যে, এর দ্বারা সম্ভবতঃ কেবল আধিক্যই উদ্দেশ্য। আরববাসীগণ কেবল আধিক্য বুঝানোর জন্য 'সত্তর' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকেন। আর "সত্তরের চাইতে আরো কিছু বেশী" বলে যা যোগ করা হয়েছে, এর দ্বারা আরো আধিক্য উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু এ বাক্য দ্বারা অনেকে নির্দিষ্ট সাতাত্তর সংখ্যাও বুঝিয়েছেন। এর ভিত্তি এই যে, 'বিয্‌উন' শব্দটি নির্দিষ্টভাবে সাত সংখ্যার জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারপর তারা নিজেদের এই মত অনুযায়ী ঈমানের ঐ সাতাত্তরটি শাখা নির্দিষ্ট করে দেখাবার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু এগুলোতে চিন্তা-ভাবনা করার পর এ মতই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এটা কেবল অনুমান ভিত্তিক, যার মধ্যে যথেষ্ট আপত্তির অবকাশ রয়েছে। তাই এ কথাটি বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয় যে, 'সত্তরের কিছু অধিক' শব্দ দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য কোন বিশেষ সংখ্যা বুঝানো নয়; বরং আরবের বাকরীতি অনুযায়ী এখানে কেবল অধিক সংখ্যা ও প্রচুর শাখা বুঝানোই উদ্দেশ্য। তাই এর অর্থ কেবল এই যে, ঈমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এ অর্থ গ্রহণ করার পক্ষে একটি প্রমাণ এই যে, এখানে 'সত্তরের কিছু অধিক' কথা দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য যদি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা হত, তাহলে তিনি এত অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত কথা বলে ছেড়ে দিতেন না; বরং এর বিস্তারিত আলোচনাও করতেন, যেমনটি অবস্থা ও সময়ের দাবী ছিল।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা দ্বারা ঐসব কাজ, স্বভাব এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা উদ্দেশ্য যা কারো অন্তরে ঈমান এসে যাওয়ার পর এর ফল হিসেবে তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া উচিত। সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ থেকে যেমন প্রচুর পাতা ও ডালপালা বের হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে সকল সৎকর্ম, সৎ স্বভাব এবং সুন্দর অবস্থা যেন ঈমানের শাখা-প্রশাখা। তবে এগুলোর স্তর বিভিন্ন হয়ে থাকে।

এ হাদীসে ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হিসাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তথা তওহীদের সাক্ষ্যদানকে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর দিকে সর্বনিম্ন শাখা হিসাবে রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাকে বলা হয়েছে। এখন এ দু'টির মাঝে যত কল্যাণকর জিনিসের কল্পনা করা যেতে পারে, এর সবগুলোই ঈমানের বিভাগ ও এর শাখা-প্রশাখা হিসাবে গণ্য হবে, চাই এগুলোর সম্পর্ক আল্লাহ্‌র হকের সাথেই হোক অথবা বান্দার হকের সাথে। আর এটা প্রকাশ্য বিষয় যে, এগুলোর সংখ্যা শত শত পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।

হাদীসের শেষে লজ্জা সম্পর্কে যে বলা হয়েছে যে, এটা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর কারণ হয়তো এই হবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ হাদীসটি বলছিলেন, তখন কারো পক্ষ থেকে লজ্জার ব্যাপারে কোন ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছিল, আর এর সংশোধনের জন্য তিনি এই বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, যেমন প্রজ্ঞাবান শিক্ষক ও সংস্কারকরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। অথবা লজ্জা সম্পর্কে বিশেষভাবে তিনি এ বাণীটি এ কারণে উচ্চারণ করেছেন যে, মানবীয় চরিত্রের মধ্যে লজ্জার স্থান অনেক উর্ধ্বে। আর লজ্জাই এমন এক স্বভাব, যা মানুষকে অনেক গুনাহ্ ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। আর এ কারণে ঈমান ও লজ্জার মধ্যে বিশেষ বন্ধন রয়েছে।

এখানে একথাও জানা দরকার যে, লজ্জা কেবল নিজের সমশ্রেণী থেকে করলেই চলবে না; বরং যার প্রতি আমাদের লজ্জা সবচেয়ে বেশী হওয়া চাই, তিনি হচ্ছেন আমাদের খালেক-মালেক মহান আল্লাহ্ তা'আলা। সাধারণ মানুষ বড় লজ্জাহীন ও বে-আদব ঐ ব্যক্তিকে মনে করে, যে নিজের বড়দের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখে না এবং তাদের সামনে লজ্জাহীনতার কাজ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সবচেয়ে বড় নির্লজ্জ হচ্ছে ঐ হতভাগা মানুষটি, যে নিজের প্রতিপালক থেকে লজ্জা করে না এবং এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বক্ষণ আমাকে এবং আমার কর্মকাণ্ডকে কোন পর্দার অন্তরায় ছাড়া পর্যবেক্ষণ করছেন এবং আমার কথা-বার্তা সরাসরি শুনে যাচ্ছেন, তাঁর সামনে সে খারাপ কাজ ও অন্যায় আচরণ করে যায়।

অতএব, মানুষের মধ্যে যদি লজ্জা গুণটি পূর্ণরূপে জাগরিত ও কার্যকর হয়, তাহলে কেবল সমশ্রেণী তথা মানুষের দৃষ্টিতেই তার জীবন পবিত্র ও অনাবিল হবে না; বরং তার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী ও অবাধ্যতাও প্রকাশ পাবে না।

তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নিজের সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন লজ্জা কর, যেমন লজ্জা তাঁকে করা উচিত। সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, আমরা তাঁকে লজ্জা করেই চলি। তিনি বললেন ঃ এটা নয়; বরং আল্লাহ্কে যথার্থভাবে লজ্জা করার দাবী হচ্ছে এই যে, মাথা এবং মস্তিষ্কে যে চিন্তা ও কল্পনা আসে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে, পেট ও পেটের ভিতর যা কিছু জমা হয়, এর প্রতিও দৃষ্টি রাখবে। (অর্থাৎ, মস্তিষ্ককে কুচিন্তা থেকে এবং পেটকে হারাম ও অবৈধ আহার থেকে হেফাযত করবে।) আর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর কবরে তোমার যে অবস্থা হবে সেটা স্মরণ রাখবে। যে ব্যক্তি এসব কিছু করে নিল, তার ব্যাপারে মনে করে নাও যে, সে আল্লাহ্কে যথার্থভাবে লজ্জা করতে শিখেছে।

ঈমানের কয়েকটি লক্ষণ

(٢٩) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ * (رواه احمد)

২৯। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ঈমানের নিদর্শন কি ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমার পুণ্য কাজ যখন তোমাকে আনন্দ দান করে আর তোমার মন্দ কাজ যখন তোমাকে দুঃখ দেয়, তখন মনে করে নাও যে, তুমি মু'মিন। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, ঈমানের বিশেষ প্রভাব ও নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটিও একটি নিদর্শন যে, মানুষ যখন কোন ভাল কাজ করে, তখন সে মনে আনন্দ অনুভব করে। আর যখন তার পক্ষ থেকে কোন গুনাহ ও মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, তখন সে অন্তরে দুঃখ ও ব্যথা অনুভব করে। যে পর্যন্ত মানুষের বিবেকের মধ্যে এই অনুভূতি অবশিষ্ট থাকবে, তখন বুঝতে হবে যে, ঈমানী আত্মা এখনও জীবিত আছে, আর এই অনুভূতিটি এরই ফল ও ফসল।

ঈমানকে পূর্ণতা দানকারী উপাদানসমূহ

(٣٠) عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً * (رواه مسلم)

৩০। হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ঈমানের স্বাদ ঐ ব্যক্তি পেয়েছে, যে আল্লাহ্কে নিজের রব, ইসলামকে নিজের দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে নিজের রাসূল ও পথপ্রদর্শক হিসাবে মেনে নিতে রাজী হয়ে গিয়েছে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়টি এভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সুস্বাদু ও মজাদার খাবারসমূহে যেমন একটা বিশেষ মজা থাকে, আর এ স্বাদ ও মজা কেবল ঐ ব্যক্তিই লাভ করতে পারে, যার আস্বাদনশক্তি কোন রোগের কারণে নষ্ট হয়ে যায়নি, তদ্রূপভাবে ঈমানের মধ্যেও এক বিশেষ স্বাদ ও মজা রয়েছে। কিন্তু এ ঈমানী স্বাদ কেবল ঐসব ভাগ্যবান লোকেরাই লাভ করতে পারবে, যারা মনের খুশী ও অন্তরের সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহ্কে নিজের প্রভু পরওয়ারদেগার, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন নবী ও রাসূল এবং দ্বীন ইসলামকে নিজের দ্বীন ও জীবনবিধান বানিয়ে নিয়েছে। যাদের অন্তর আল্লাহ্র গোলামী, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং ইসলামী জীবনধারার অনুসরণকে আপন করে নিয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক কেবল প্রথাগত অথবা পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত বস্তুর মত অথবা কেবল জ্ঞানগত ও বুদ্ধিগত হলেই চলবে না; বরং এগুলোর সাথে আন্তরিক বশ্যতা ও প্রেমও থাকতে হবে। এ কথাটিই হাদীসে 'রাজী হয়ে গিয়েছে' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, তার জন্য ঈমানী স্বাদ ও মজারও কোন অংশ নেই, আর তার ঈমানও পরিপূর্ণ নয়।

(٣١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ * (رواه البخارى و مسلم)

৩১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তিই পাবে, যার মধ্যে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে ঃ (১) আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ভালবাসা তার কাছে সকল জিনিসের চেয়ে বেশী হবে। (২) যার সাথেই তার ভালবাসা হবে, তা কেবল আল্লাহ্র জন্যই হবে। (৩) ঈমানের পর কুফরীতে ফিরে যাওয়া তার নিকট এমন কষ্টদায়ক মনে হবে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন কষ্টদায়ক মনে হয়ে থাকে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির বিষয়বস্তুও প্রায় পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায়, কেবল বর্ণনাভঙ্গীর সামান্য পার্থক্য রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তিই লাভ করতে পারবে, যে আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসায় এমন মত্ত হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসা

সবকিছুর চেয়ে প্রবল থাকে এবং এ ভালবাসা এমন একচ্ছত্রভাবে তার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যায় যে, সে যদি অন্য কাউকেও ভালবাসতে চায়, তাহলে সেটাও আল্লাহ্‌র জন্যই করে থাকে। আর আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলাম তার কাছে এমন প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়ে যায় যে, সেখান থেকে ফিরে আসার কল্পনাও তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত কষ্টদায়ক মনে হয়।

(٣٢) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ * (رواه البخارى ومسلم)

৩২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও অপরাপর সকল মানুষ থেকে অধিকতর প্রিয় না হই। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, ঈমানের পরিপূর্ণতা তখনই হতে পারে, তথা একজন মুসলমান পূর্ণ মু'মিন তখনই হতে পারে, যখন দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে এমনকি নিজের পিতা-মাতা ও সন্তানাদি থেকেও বেশী ভালবাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি থাকবে।

এর আগের হাদীসটিতে অন্য সকলের চাইতে আল্লাহ্‌র ভালবাসা, রাসূলের ভালবাসা ও ইসলামের ভালবাসা অধিক হওয়াকে ঈমানের স্বাদ লাভের পূর্বশর্ত বলা হয়েছে। আর এ হাদীসে কেবল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসা এবং ইসলামের ভালবাসার মধ্যে এমন সম্পর্ক রয়েছে যে, এর একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং ইসলামের প্রতি খাঁটি ভালবাসা আল্লাহ্‌র রাসূলের ভালবাসা ছাড়া সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র এবং ইসলামের ভালবাসা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার কল্পনাও করা যায় না। কেননা, রাসূলের প্রতি যে ভালবাসা রাসূল হিসাবে হবে, সেটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের কারণেই হবে। আর এর অপরিহার্য ফল এ হবে যে, ইসলামের প্রতিও তার পূর্ণ ভালবাসা থাকবে। এ জন্য এ হাদীসে ঈমানের পূর্ণতার জন্য কেবল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মর্ম উহাই যে, ঈমানের আলো ও এর বরকত কেবল ঐ ভাগ্যবানরাই লাভ করতে পারবে, যাদের অন্তরে আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসা এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা এমন প্রবল যে, এর সামনে অন্য সকল ভালবাসা পরাভূত হয়ে যায়।

এ হাদীসসমূহে আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি ভালবাসার যে দাবী উল্লেখ করা হয়েছে, এর মর্ম নির্ধারণে হাদীস ব্যাখ্যাতাদের বক্তব্য অভিন্ন নয়। যে কারণে অনেকের পক্ষে এর মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝে উঠা কঠিন হয়ে পড়েছে, অথচ যে বাস্তবতাটি এ হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও সহজ। ভালবাসা একটি পরিচিত শব্দ, আর এর অর্থও সুবিদিত, আর সে অর্থই এখানে উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথে মু'মিনদের যে ভালবাসা হয়ে থাকে, সেটা পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্রদের ভালবাসার ন্যায় রক্তের সম্পর্ক অথবা অন্য কোন

সহজাত প্রবৃত্তির কারণে হয় না; বরং আত্মিক ও জ্ঞান বিবেচনায় হয়ে থাকে। আর এই ভালবাসা যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন এর বাইরে অন্যান্য ভালবাসা যা মানুষের স্বভাবগত চাহিদা অথবা প্রবৃত্তির কারণে হয়ে থাকে, সেটা এর সামনে পরাজিত ও পরাভূত হয়ে যায়। এ কথাটি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিই বুঝতে পারে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা এর কিছুটা অংশ দিয়ে থাকেন।

সারকথা, এসব হাদীসে ভালবাসা দ্বারা অন্তরের ঐ অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা ভালবাসা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে, আর আমাদের কাছে এ জিনিসটিরই দাবী করা হয়েছে। আসলে এ জিনিসটিই আমাদের ঈমানের প্রাণতুল্য। কুরআন মজীদেও এরশাদ হয়েছে ঃ "ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী ভালবাসা আল্লাহ্র প্রতিই রাখে।" (সূরা বাকারা) অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ "হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই-বেরাদর, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের গোত্র, তোমাদের কষ্টার্জিত সম্পদ, তোমাদের ঐ চালু ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর, (দুনিয়ার এসব পছন্দনীয় ও আকর্ষণীয় জিনিসসমূহ) আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ্র হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা তওবা)

অতএব, পবিত্র কুরআনের এ মহত্বপূর্ণ আয়াতের দাবী ও আবেদনও এটাই যে, ঈমানদারদের অন্তরে তাদের সকল প্রিয় জিনিসের চেয়ে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের ভালবাসা বেশী থাকতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর বিশেষ হেদায়াত লাভ করা সম্ভব হবে না এবং ঈমানের পূর্ণতাও লাভ করা যাবে না।

এটা প্রকাশ্য বিষয় যে, যে ব্যক্তি এ সম্পদ ও সৌভাগ্য অর্জন করে নিতে পারবে, তার জন্য ঈমানের সকল দাবী পূরণ করা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানের উপর চলা কেবল সহজই হবে না; বরং এ পথে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও সে অন্তরে স্বাদ অনুভব করবে। পক্ষান্তরে যার অন্তরে আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসার এই প্রাবল্য থাকবে না, তার জন্য প্রাত্যহিক ইসলামী বিধান পালন ও ঈমানের সাধারণ দাবী পূরণও কঠিন মনে হবে। সে এ পথে যতটুকু করবে, সেটা কেবল আইন পালন হিসাবেই করবে। এর বেশী কিছু তার কাছে আশা করা যায় না। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসা অন্য সকল ভালবাসার উপর জয়ী না হবে, সে পর্যন্ত ঈমানের প্রকৃত মর্তবা লাভ করা সম্ভব হবে না এবং ঈমানের স্বাদ এবং মজাও পাওয়া যাবে না।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার ভালবাসা, তোমার রাসূলের ভালবাসা এবং ঐ কাজের ভালবাসা দান কর, যা আমাদেরকে তোমার ভালবাসা লাভে ধন্য করবে।

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ * (رواه البغوى فى شرح السنة)

৩৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত হেদায়াতের বশীভূত না হয়ে যায়। —শরহুস্‌সুন্নাহ্

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, প্রকৃত ঈমান তখনই লাভ হতে পারে এবং ঈমানের বরকতসমূহ তখনই ভাগ্যে জুটতে পারে, যখন মানুষের অন্তরের ঝোঁক এবং মনের চাহিদাসমূহ সম্পূর্ণরূপে নবীর হেদায়াত ও দিকনির্দেশনার অধীন ও বাধ্যগত হয়ে যাবে।

এ হাদীসে উল্লেখিত দু'টি শব্দ 'হাওয়া'এবং 'হুদা' সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশক। 'হাওয়া'র অর্থ হচ্ছে প্রবৃত্তি আর 'হুদা'র অর্থ হচ্ছে নবী-রাসূল কর্তৃক আনীত হেদায়াত। এ দু'টি এমন জিনিস যে, এগুলোর উপরই কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তি রচিত হয়ে থাকে। প্রতিটি পথভ্রষ্টতা ও পাপাচার 'হাওয়া'কে অনুসরণ করার ফল। অপরদিকে সকল কল্যাণ ও পুণ্য 'হুদা'র অনুসরণ দ্বারা লাভ হয়ে থাকে। তাই প্রকৃত ঈমান তখনই ভাগ্যে জুটবে, যখন 'হাওয়া' অর্থাৎ, প্রবৃত্তিকে 'হুদা' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত হেদায়াত ও শিক্ষার অনুগত করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি 'হুদা'কে ছেড়ে দিয়ে 'হাওয়া'র দাসত্ব অবলম্বন করবে, সে যেন নিজেই ঈমানের উদ্দেশ্যকে পদদলিত করে ফেলল।

কুরআন পাকে এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আপন প্রবৃত্তিকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ "আপনি কি ঐ সব হতভাগাদেরকে দেখেছেন, যারা নিজেদের নফ্সের খাহেশ তথা প্রবৃত্তিকেই আপন মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে ? (সূরা ফুরকান)

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াতকে বাদ দিয়ে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে ? আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা কাছাছ)

(٣٤) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ * (رواه البخارى و مسلم)

৩৪। হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে আপন ভাইয়ের জন্য তাই কামনা করে, যা নিজের জন্য কামনা করে থাকে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, ঈমানের কাংখিত স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে হলে এবং এর বিশেষ বরকত লাভ করতে চাইলে এটাও জরুরী যে, মানুষ স্বার্থপরতা থেকে পবিত্র থাকবে। তার অন্তরে নিজের অন্যান্য ভাইদের প্রতি এতটুকু কল্যাণকামিতা থাকবে যে, যেসব নেয়ামত, কল্যাণ এবং মঙ্গল সে নিজের জন্য কামনা করে, অন্যান্য ভাইদের জন্যও সেটাই কামনা করবে। আর যে বিষয় ও যে অবস্থা সে নিজের জন্য পছন্দ করে না, অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে না। এই গুণটি ছাড়া ঈমানের মধ্যে পূর্ণতা আসতে পারে না।

ইবনে হিব্বান বর্ণিত এ হাদীসেই "তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না" স্থলে এ শব্দমালা এসেছে ঃ "কোন মানুষ ঈমানের কাংখিত স্তরে পৌঁছতে পারবে না।" এর দ্বারা এই কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, এ হাদীসে এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসে যে 'মু'মিন হতে পারবে না' কথাটি বলা হয়েছে, এর দ্বারা মূল ঈমানের অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য নয়; বরং ঈমানের পূর্ণতার অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ, সে পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না।) কোন অপূর্ণ জিনিসকে অস্তিত্বহীন সাব্যস্ত করে এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার রেওয়াজ প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই রয়েছে।

যেমন, আমাদের ভাষায়ও কোন খারাপ ও অসভ্য মানুষের বেলায় বলে দেওয়া হয়, এর মধ্যে তো মনুষ্যত্বই নেই অথবা এমন বলা হয়, 'এতো মানুষই নয়।' অথচ এর অর্থ এ হয় যে, সে কোন ভাল এবং মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ নয়। তাই এ রীতি অনুযায়ীই অনেক হাদীসে ঈমানের অপূর্ণতাকে 'ঈমান নেই' অথবা 'মু'মিন হতে পারবে না' বলে প্রকাশ করা হয়েছে। আর কাউকে দীক্ষাদান ও উপদেশ দানের ক্ষেত্রে এ বর্ণনাভঙ্গীটিই সবচেয়ে উপযোগী ও উত্তম মনে করা হয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রে যুক্তিবিজ্ঞানীদের মত তত্ত্বালোচনায় লিপ্ত হওয়া আসলে নবুওতের মেযাজ ও স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং রুচিহীনতার প্রমাণ।

(٣٥) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ اَنَّهٗ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَفْضَلِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَ تُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ * (رواه احمد)

৩৫। মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমানের সর্বোত্তম বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। (অর্থাৎ, ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্তর কোন্‌টি এবং কোন্ আমল ও আখলাক দ্বারা সেটা লাভ করা যায়?) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালবাসবে এবং আল্লাহ্‌র জন্যই শত্রুতা পোষণ করবে, (অর্থাৎ, যার সাথেই তোমার মিত্রতা অথবা শত্রুতা থাকবে সেটা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই হওয়া চাই।) এবং নিজের রসনাকে তুমি আল্লাহ্‌র যিকিরে লাগিয়ে রাখবে। মো'আয (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর কি? তিনি বললেন ঃ অন্য মানুষের জন্যও তুমি তাই কামনা করবে, যা নিজের জন্য কামনা কর, আর তাদের জন্য তাই অপছন্দ করবে, যা নিজের জন্য অপছন্দ কর। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মো'আয (রাঃ)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমান তখনই ভাগ্যে জুটবে, যখন মানুষের মধ্যে এ তিনটি গুণ সৃষ্টি হয়ে যায় ঃ (১) আল্লাহ্‌র জন্যই কারো সাথে মিত্রতা অথবা শত্রুতা। (২) রসনাকে আল্লাহ্‌র যিকিরে ব্যস্ত রাখা। (৩) আল্লাহ্‌র বান্দাদের এমন কল্যাণ কামনা করবে যে, নিজের জন্য যা চাইবে, অন্য সবার জন্যও তাই চাইবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে, তা অন্য কারো জন্যই পছন্দ করবে না।

(٣٦) عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِاسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ * (رواه ابوداؤد)

৩৬। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালবাসে, আল্লাহ্‌র জন্যই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে, কাউকে কিছু দিলে আল্লাহ্‌র জন্যই দিয়ে থাকে এবং কাউকে বঞ্চিত করলে আল্লাহ্‌র জন্যই বঞ্চিত করে, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিয়েছে। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি নিজের সকল গতি ও বিরতি এবং নিজের সকল আবেগ অনুভূতিকে এমনভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অধীন করে দিয়েছে যে, সে যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তা স্থাপন করে, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্র জন্যই ছিন্ন করে, যাকে কিছু দান করে, আল্লাহ্র জন্যই দান করে এবং যার নিকট থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই গুটিয়ে নেয়। এক কথায় যার ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল আন্তরিক অনুরাগ ও আবেগ, যেমন মিত্রতা ও শত্রুতা এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল বাহ্যিক কর্মকাণ্ড যেমন কাউকে কিছু দেওয়া অথবা না দেওয়া এসব কিছুই যখন কেবল আল্লাহ্র জন্য হতে শুরু করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া এর পেছনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বা কার্যকারণ থাকে না। সারকথা, আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক এবং পূর্ণ দাসত্বসুলভ আচরণের এই স্তর যে অর্জন করে নিয়েছে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে।

(٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِىْ ذَرٍّ اَىُّ عُرَى الْاِيْمَانِ اَوْثَقُ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَلْمُوَالَاةُ فِى اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৩৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বল তো, ঈমানের কোন্ হাতলটি বেশী মজবুত ? (অর্থাৎ, ঈমানের কোন্ শাখাটি বেশী স্থায়িত্বশীল ?) আবূ যর উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। (তাই আপনিই বলুন।) তিনি তখন বললেন ঃ আল্লাহ্র জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করা। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, ঈমানী কর্মকাণ্ড ও অবস্থাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও দীর্ঘস্থায়ী আমল ও অবস্থা হল, দুনিয়াতে বান্দার সাথে বান্দার যে আচরণ হবে, তা সহযোগিতাই হোক অথবা অসহযোগিতা, ভালবাসাই হোক বা শত্রুতা, এটা প্রবৃত্তির তাড়না অথবা মনের আবেগে হবে না; বরং কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই নির্দেশের অধীনে হবে।

(٣٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَاتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ * (رواه مسلم)

৩৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত ঈমানের অধিকারী না হবে। আর তোমরা পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের একজন অপরজনকে ভাল না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলে দিব না, যার উপর আমল করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হবে ? সে বিষয়টি হচ্ছে, তোমরা তোমাদের মাঝে ব্যাপকভাবে সালামের রেওয়াজ চালু করবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরের হাদীসসমূহ থেকে বুঝা গিয়েছিল যে, কোন বান্দার ঈমানের পূর্ণতার জন্য এটা জরুরী যে, তার মধ্যে আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি এবং দ্বীনের প্রতি সবচেয়ে বেশী ভালবাসা থাকতে হবে এবং তাঁদের বাইরে যার সাথেই ভালবাসা হোক, এটা তাদের সম্পর্কের কারণেই হতে হবে। আর বান্দার অন্তর স্বার্থপরতা থেকে পবিত্র থাকতে হবে এবং তার অবস্থা এ হতে হবে যে, সে নিজের জন্য যা চাইবে, অপরের জন্যও তাই কামনা করবে, নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে, অন্যের জন্যও তা অপছন্দ করবে। এখন এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, ঈমানের দাবিদার কোন জাতি ও কোন সমাজের ঈমানের পূর্ণতার জন্য এটাও জরুরী যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহমর্মিতা থাকবে। তাদের একজনের অন্তর যদি অপরজনের ভালবাসা থেকে শূন্য থাকে, তাহলে মনে করতে হবে যে, এরা ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ ও এর বরকত ও সুফল থেকে বঞ্চিত।

(٣٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ * (رواه الترمذى والنسائى)

৩৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার মুখের অনিষ্ট ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আর মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার পক্ষ থেকে মানুষ তাদের জীবন ও সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। —তিরমিযী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে কেবল মুখ ও হাতের কথা এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়ার কাজটি এ দু'টি অঙ্গের দ্বারাই হয়ে থাকে। অন্যথায় হাদীসটির মর্ম ও উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই যে, মুসলমানের মর্যাদার দাবী এটাই যে, তার দ্বারা মানুষের কোন প্রকার কষ্ট হবে না।

ইবনে হিব্বানের রেওয়ায়াতে এই হাদীসেই 'মুসলমান নিরাপদ থাকে' শব্দের স্থলে 'মানুষ নিরাপদ থাকে' বাক্য এসেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, একজন মুসলমান থেকে সমগ্র মানবজাতিই নিরাপদ ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকবে।

কিন্তু একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, এখানে যে কষ্ট দেওয়াকে ইসলাম পরিপন্থী বলা হয়েছে। সেটা হচ্ছে ঐ কষ্ট যা যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ও শরয়ী কোন ভিত্তি ছাড়া দেওয়া হয়। অন্যথায় শক্তি থাকলে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়া, জালেমদের অন্যায়, বাড়াবাড়ি ও দুষ্কৃতিকারীদের দুষ্কৃতিকে শক্তি প্রয়োগে দমন করা, এটা তো মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। এটা না করলে পৃথিবী থেকে শান্তি ও নিরাপত্তাই বিদায় নিয়ে যাবে।

(٤٠) عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لَا يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ * (رواه البخارى)

৪০। আবূ শুরাইহ্ খুযায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম, ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহ্র কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহ্র

কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে মু'মিন নয় ? তিনি বললেনঃ ঐ ব্যক্তি, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তাবোধ করে না। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ নিজের প্রতিবেশীদের সাথে এমন সুন্দর আচরণ ও ভদ্র ব্যবহার করা চাই, যাতে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকে। কোন অন্যায়-অবিচার ও অনিষ্টের আশংকা যেন তাদের অন্তরে স্থান না পায়। এটা ঈমানের ঐসব শর্ত ও অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো ব্যতীত ঈমান যেন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তুমি নিজ প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর, মু'মিন হতে পারবে। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী) অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। —বুখারী, মুসলিম

(٤١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৪১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে নিজে পেট ভরে খায়, আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী উপোস করে দিন কাটায়। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ নিজের প্রতিবেশীর ক্ষুধা ও উপবাস থেকে উদাসীন থেকে যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে আহার করে, সে (সত্তর পুরুষ থেকে মুসলমান হলেও) ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ থেকে বঞ্চিতই রয়েছে। তার এই পাষাণ হৃদয় ও স্বার্থপরতার অবস্থাটি ঈমানের মর্যাদার সম্পূর্ণ বিপরীত।

[আমরা মুসলমান হয়ে নিজেদের প্রতিবেশীদের সাথে এবং আল্লাহ্র সাধারণ বান্দাদের সাথে যে আচরণ ও ব্যবহার করে থাকি সেটা সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণীর আলোকে আমরা যেন নিজেদের ঈমানের একটু পরীক্ষা নিয়ে দেখি যে, এসব হাদীসের আলোকে আমাদের অবস্থান কোথায়, আমরা কোথায় আছি।]

(٤٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا * (رواه ابوداؤد والدارمى)

৪২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল। —আবূ দাউদ, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, ঈমানের পূর্ণতা সুন্দর চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তাই যে যত উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে, তার ঈমানও ততটুকু পূর্ণাঙ্গ হবে। কথাটি এভাবেও বলতে পারেন যে, চরিত্র মাধুর্য ঈমানের পরিপূর্ণ অনিবার্য ফল ও ফসল। তাই যার ঈমান যতটুকু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে, সেই অনুসারে তার চরিত্রও উন্নত হবে। এটা হতেই পারে না যে, এক ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ অর্জন করে নিবে, অথচ তার চরিত্র ভাল হবে না।

(٤٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ * (رواه ابن ماجة والترمذى والبيهقى فى شعب الايمان)

৪৩। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের ইসলামী জীবনাচারের একটি সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এই যে, সে উদ্দেশ্যহীন ও অহেতুক কথা ও কাজ পরিহার করে চলে। —ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ আশরাফুল মখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে খুবই দামী বানিয়েছেন। তিনি চান যে, মানুষকে সময় ও যোগ্যতার যে সম্পদ দান করা হয়েছে, তা যেন তারা কোনভাবেই নষ্ট না করে; বরং যথাযথভাবে তা কাজে লাগিয়ে অধিক উন্নতি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে। এটাই হচ্ছে দ্বীনের সকল শিক্ষার সার এবং এটাই হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের উদ্দেশ্য। তাই যে ভাগ্যবান ব্যক্তি এটা কামনা করে যে, তার ঈমানে পূর্ণতা আসুক এবং তার ইসলামে কোন দাগ ও আবিলতা না থাকুক, তার জন্য একান্ত জরুরী হচ্ছে প্রকাশ্য গুনাহ এবং চারিত্রিক অধঃপতন থেকে আত্মরক্ষা ছাড়াও সকল অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীন কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা এবং নিজের মূল্যবান সময় ও খোদাপ্রদত্ত শক্তি এবং যোগ্যতাকে কেবল এইসব কাজে ব্যয় করা, যার মধ্যে কল্যাণ ও লাভের কোন দিক রয়েছে অর্থাৎ, যা আখেরাতের উন্নতি সাধনে অথবা দুনিয়ার জীবনধারণের জন্য জরুরী ও উপকারী। এটাই এই হাদীসের মর্ম।

যেসব লোক অবহেলার দরুন অহেতুক কথা ও কর্মে নিজের মূল্যবান সময় এবং নিজের মেধা ও শক্তি ব্যয় করে দেয়, এ মূর্খরা জানেই না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কত দামী বানিয়েছেন। তারা এটাও জানে না যে, কি মূল্যবান রত্ন-ভাণ্ডার তারা ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছেন। এ সত্যটি যারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তারাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং তারাই নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে শিখেছেন।

(٤٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى اُمَّةٍ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ لَهٗ مِنْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَ اَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَ يَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ وَ يَفْعَلُوْنَ مَالَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ * (رواه مسلم)

৪৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন উম্মতের মধ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, সেই উম্মতের মধ্যে তাদের কিছু ঘনিষ্ট সহচর ও যোগ্য সাথী থাকত, যারা তাঁদের আদর্শের উপর চলত এবং তাঁদের নির্দেশের অনুসরণ করত। তারপর এমন হত যে, তাদের অযোগ্য উত্তরসূরীরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যেত। তাদের অবস্থা এ ছিল যে, তারা যা বলত তা নিজেরা করত না। (অর্থাৎ, অন্য লোকজনকে তো ভাল কাজ করতে বলত, কিন্তু নিজেরা

তা করত না অথবা অর্থ এই যে, ভাল কাজ তো তারা করত না, কিন্তু মানুষকে বলত যে আমরা তা করে থাকি। এভাবে যেন তারা নিজেদের বুযুর্গী ও পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য মিথ্যার আশ্রয়ও নিত।) আর যে কাজের নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়নি সেটাই করত। (অর্থাৎ, তারা নিজেদের নবী-রাসূলের আদর্শ ও তাদের আদেশ-নিষেধের উপর তো আমল করত না, কিন্তু যেসব পাপাচার ও বেদআতের হুকুম দেওয়া হয়নি সেগুলো তারা খুব বেশী করেই করত।) তাই যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জেহাদ করেছে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি (অপারগ অবস্থায়) শুধু মুখ দিয়ে জেহাদ করেছে সেও মু'মিন। আর যে ব্যক্তি (মুখের জেহাদ থেকেও অপারগ হয়ে) শুধু অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছে (অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা তাদেরকে ঘৃণা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্তরে ক্ষোভ ও ক্রোধ পোষণ করেছে) সেও মু'মিন। (এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর) এর নীচু স্তরে আর সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নেই। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম ও এর প্রাণ এটাই যে, নবী-রাসূল এবং বুযুর্গানে দ্বীনের স্থলবর্তী ও তাদের ভক্তদের মধ্যে যারা ভুল পথের যাত্রী এবং দুষ্কর্মপরায়ণ, যারা অন্যদেরকে তো নেক কাজের দাওয়াত দেয়; কিন্তু নিজেরা আমল করে না অথবা বদ আমলে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে সাধ্য অনুযায়ী হাত দিয়ে অথবা মুখ দিয়ে জেহাদ করা অথবা কমপক্ষে অন্তরে এ জেহাদের ইচ্ছা পোষণ করা ঈমানের বিশেষ শর্ত ও অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরেও এ জেহাদের প্রেরণা অনুভব করে না, তার অন্তর ঈমানী জোশ এবং হৃদয়ের উত্তাপ থেকে একেবারে শূন্য। হাদীসে বর্ণিত 'এর নীচে আর সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নেই' কথাটির মর্ম এটাই। সামনের হাদীসে এটাকেই 'ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর' বলা হয়েছে।

স্মরণযোগ্য যে, নবী-রাসূল এবং দ্বীনের পূর্বসূরীগণের অযোগ্য স্থলবর্তীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার যে নির্দেশ রয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে সংশোধন ও সুপথে আনার চেষ্টা করতে হবে। তারপরও যদি নৈরাশ্যই দেখা দেয়, তাহলে তাদের মন্দ প্রভাব থেকে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের মিথ্যা দেবত্ব ও তাদের পৈত্রিক প্রভাব ও কর্তৃত্বকে শেষ করে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(٤٥) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ * (رواه مسلم)

৪৫। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন গর্হিত ও শরীঅতবিরোধী কাজ হতে দেখবে, তার কর্তব্য হচ্ছে (শক্তি থাকলে) তা হাত দিয়ে প্রতিহত করা, তা না পারলে মুখ দিয়ে এর প্রতিবাদ করা। এটাও সম্ভব না হলে অন্ততঃ অন্তর দিয়ে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করা, আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এর পূর্ববর্তী হাদীসে একটা বিশেষ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর অপকর্মের বিরুদ্ধে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধের চেষ্টাকে ঈমানের অপরিহার্য দাবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ হাদীসে সকল অপকর্ম ও মন্দ কাজকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য ব্যাপক নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। উপরে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় এখানেও এর তিনটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে ঃ (১) যদি শক্তি ও ক্ষমতা থাকে এবং এর দ্বারা এটা প্রতিহত করা সম্ভব হয়, তাহলে শক্তি প্রয়োগ করে তা প্রতিহত করতে হবে। (২) যদি নিজের হাতে ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মৌখিকভাবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ও উপদেশের মাধ্যমে এটাকে ফিরানোর এবং সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। (৩) যদি অবস্থা এমন প্রতিকূল হয় এবং দ্বীনদার লোকেরা এমন দুর্বল অবস্থানে থাকে যে, এ মন্দ কাজের বিরুদ্ধে মুখ খোলারও অবকাশ নাই, তাহলে শেষ স্তর হচ্ছে ইহাই যে, মনে মনে এটাকে ঘৃণা করতে হবে এবং এর প্রতিবিধানের প্রেরণা অন্তরে রাখতে হবে। যার অনিবার্য ফল অন্ততঃ এতটুকু হবে যে, অন্তর সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দু'আ করতে থাকবে এবং কৌশল অবলম্বনের কথাও চিন্তা করবে। এই শেষ স্তরটিকে হাদীসে 'ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এটা হচ্ছে ঈমানের ঐ শেষ ও দুর্বল স্তর, যার পরে ঈমানের আর কোন স্তরই হতে পারে না। এ কথাটিই প্রথম হাদীসটিতে অন্য শব্দমালায় বলা হয়েছে।

এ হাদীসের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের উপর এটা ওয়াজিব যে, তার সামনে যদি এ ধরনের কোন অপকর্ম হয়, যা শক্তি ও বল প্রয়োগে প্রতিহত করা যায়, তাহলে শক্তি থাকলে সেটা প্রয়োগ করেই তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। যদি হাতে প্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকে, তা হলে মুখে বুঝিয়ে শুনিয়ে এখানে কাজ নেবে। আর অবস্থা যদি একেবারেই প্রতিকূল হয়, তাহলে কমপক্ষে অন্তরে এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ব্যথা হলেও রাখবে।

(٤٦) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ قَالَ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ * (رواه البيهقي في شعب الايمان)

৪৬। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এমন খুব কমই হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দিয়েছেন আর এতে তিনি একথা বলেননি ঃ যার মধ্যে আমানত রক্ষার চরিত্র নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিজ্ঞা রক্ষার মনোবৃত্তি নেই, তার মধ্যে দ্বীন নেই। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ আমানতদারী ও প্রতিজ্ঞা রক্ষার মনোবৃত্তি থেকে কোন মানুষের অন্তর শূন্য থাকা দ্বীন ও ঈমান থেকে তার বঞ্চিত থাকারই প্রমাণ। কেননা, আমানত রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালন ঈমান ও ইসলামের অপরিহার্য দাবীসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ইতোপূর্বেও অনেক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ ধরনের হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য এ নয় যে, এমন ব্যক্তি ইসলামের সীমানা থেকে বের হয়ে যায় এবং তার উপর ইসলামের পরিবর্তে কুফরের বিধান জারী করা যায়; বরং এর মর্ম কেবল ইহাই যে, এ ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ ও এর আলো থেকে বঞ্চিত। আর এর ফল এ দাঁড়ায় যে, তার ঈমান খুবই দুর্বল এবং প্রাণহীন হয়ে যায়।

ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক চরিত্র ও কর্মসমূহ

(٤٧) عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْاِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ * (رواه البيهقي فى شعب الايمان)

৪৭। বাহ্‌য ইবনে হাকীম নিজের পিতার সূত্রে আপন দাদা মু'আবিয়া ইবনে হায়দাহ কুশায়রী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রোধ ও গোস্বা ঈমানকে এভাবে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন মুছাব্বর মধুকে বিনষ্ট করে দেয়। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃতপক্ষে রাগ-গোস্বা এমন ঈমানবিধ্বংসী জিনিস যে, যখন কারো উপর এটা চেপে বসে, তখন সে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যায় এবং তার মুখ দিয়ে এমন কথা বের হয়ে যায়, যা তার দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করে দেয় এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের দৃষ্টি থেকে সে মাহরূম হয়ে যায়।

(٤٨) عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهٗ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৪৮। আউস ইবনে শুরাহ্‌বীল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জালেমের সহায়তার জন্য তার সাথে গেল, অথচ সে জানে যে, এই ব্যক্তিটি জালেম, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ যখন জুলুমে অংশীদার হওয়া এবং জেনে শুনে জালেমের সহায়তা করা এত বড় গুনাহ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে আখ্যায়িত করেন, তাহলে বুঝে নেয়া যায় যে, স্বয়ং জুলুম ঈমান ও ইসলামের কতটুকু পরিপন্থী এবং আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দৃষ্টিতে জালিমের স্থান কোথায়।

(٤٩) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشُ وَلَا الْبَذِىْ * (رواه الترمذى والبيهقى فى شعب الايمان)

৪৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি ভর্ৎসনাকারী হয় না, অভিসম্পাতকারীও হয় না, অশ্লীল এবং কটুভাষীও হয় না। —তিরমিযী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, কটুভাষা প্রয়োগ করা, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা এবং অপরের সাথে মুখ বাড়াবাড়ি করা, এ অভ্যাসগুলো ঈমানের পরিপন্থী। মুসলমানকে এগুলো থেকে পবিত্র থাকতে হবে।

(٥٠) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ اَنَّهٗ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهٗ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا قَالَ نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهٗ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا * (رواه مالك والبيهقى فى شعب الايمان مرسلا)

৫০। ছফওয়ান ইবনে সুলাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুসলমান কি ভীরু হতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন ঃ

হ্যাঁ। (কোন মুসলমানের মধ্যে এ দুর্বলতা থাকতে পারে।) তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হল, মুসলমান কি কৃপণ হতে পারে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। (কোন মুসলমানের মধ্যে এ দুর্বলতাও থাকতে পারে।) তারপর আবার জিজ্ঞাসা করা হল, মুসলমান কি মিথ্যুক হতে পারে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। (অর্থাৎ, ঈমানের সাথে নির্ভয়ে মিথ্যা বলার বদভ্যাস একত্রিত হতে পারে না এবং ঈমান মিথ্যাকে বরদাশত করতে পারে না।) —মুয়াত্তা মালেক, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, কৃপণতা এবং ভীরুতা যদিও মন্দ স্বভাব; কিন্তু এ দু'টি মানুষের কিছুটা এমন সৃষ্টিগত দুর্বলতা যে, একজন মুসলমানের মধ্যেও তা থাকতে পারে। কিন্তু মিথ্যার অভ্যাস এবং ঈমানের মধ্যে এমন বৈপরিত্য যে, এ দু'টি এক সাথে থাকতে পারে না।

(٥١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَغُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ * (رواه البخارى و مسلم)

৫১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না, যখন সে মু'মিন থাকে। কোন চোর চুরি করতে পারে না, যখন সে মু'মিন থাকে। কোন মদ্যপানকারী মদ্যপান করতে পারে না, যখন সে মু'মিন থাকে। কোন লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠন করতে পারে না এমতাবস্থায় যে, মানুষ তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, অথচ সে মু'মিন। আর তোমাদের কেউ খেয়ানত করতে পারে না, যখন সে মু'মিন থাকে। অতএব, (হে ঈমানদারগণ! তোমরা এসব ঈমানপরিপন্থী বিষয় থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা কর! রক্ষা কর!! —বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমেই হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান, লুণ্ঠন এবং খেয়ানতের সাথে অন্যায় হত্যারও উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, এতে এ বাক্যসমূহও সংযোজিত রয়েছে ঃ "কোন হত্যাকারী হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে না, যখন সে মু'মিন থাকে।"

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান, হত্যা, লুণ্ঠন এবং খেয়ানত- এসব কর্মকাণ্ড ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে সময় কোন মানুষ এসব অপকর্মে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তরে ঈমানের আলো মোটেই থাকে না। হাদীসের মর্ম এ নয় যে, সে ইসলামের সীমানা থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে কাফেরদের সাথে শামিল হয়ে যায়। স্বয়ং ইমাম বুখারী এ হাদীসের মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন ঃ এই ব্যক্তি যখন গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন সে পূর্ণ মু'মিন থাকে না এবং তার অন্তরে ঈমানের নূর থাকে না। —বুখারী, কিতাবুল ঈমান

বিষয়টি এভাবে বুঝে নিতে হবে যে, অন্তরে যে বিশেষ অবস্থাটির নাম ঈমান, সেটা যদি প্রাণবন্ত ও জাগ্রত থাকে এবং অন্তর যদি এর নূরে আলোকিত হয়, তাহলে মানুষ কখনো এসব গুনাহে লিপ্ত হতে পারে না। এমন জঘন্য গুনাহের প্রতি মানুষের কদম কেবল তখনই উঠতে

পারে, যখন অন্তরে ঈমানের প্রদীপটি প্রজ্বলিত না থাকে এবং ঈমানের ঐ বিশেষ অবস্থাটি উধাও হয়ে যায় অথবা কোন কারণে তা প্রাণহীন ও নিস্তেজ হয়ে যায়, যা মানুষকে গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে শক্তির জোগান দিয়ে থাকে।

যাহোক, হাদীসের পাঠককে এ মৌলিক বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের হাদীসসমূহে যেখানে বিশেষ বিশেষ মন্দ ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা এগুলোতে লিপ্ত হয়, তাদের মধ্যে ঈমান নেই অথবা তারা মু'মিন নয়, অনুরূপভাবে ঐসব হাদীস যেখানে কোন কোন নেক আমল ও সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা এগুলো বর্জন করবে, তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত অথবা তারা মু'মিন নয়- এগুলোর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তারা ইসলামের সীমানা থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে গিয়েছে এবং এখন তাদের উপর ইসলামের স্থলে কুফরের বিধান জারী হবে এবং আখেরাতে তাদের সাথে ঠিক কাফেরদের মতই আচরণ করা হবে; বরং উদ্দেশ্য কেবল এটাই হয়ে থাকে যে, এরা ঐ প্রকৃত ঈমান থেকে বঞ্চিত, যা মুসলমানদের মাহাত্ম্যের প্রতীক এবং যা আল্লাহ্র নিকট খুবই প্রিয়। এই জন্য এখানে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'পরিপূর্ণ' অথবা 'পূর্ণাঙ্গ' শব্দ যোগ করার কোন প্রয়োজন নেই; বরং এটা রুচিবোধের পরিপন্থী।

প্রত্যেক ভাষারই এটা সাধারণ বাকরীতি যে, কারো মধ্যে কোন গুণ ও বৈশিষ্ট্য যদি খুব কম মাত্রায় এবং দুর্বল পর্যায়ের থাকে, তাহলে সেটাকে না থাকার পর্যায়ে ধরে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে দাওয়াত, ভাষণ এবং উৎসাহদান ও ভয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এই বাক-পদ্ধতিই বেশী উপযোগী ও অধিক প্রয়োগ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ এ হাদীসটির কথাই ধরা যাক। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচার, চুরি, অন্যায়, হত্যা ইত্যাদি গুনাহ সম্পর্কে বলেছেন যে, যখন লোকেরা এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়, তখন তারা মু'মিন থাকে না। এর স্থলে তিনি যদি এভাবে বলতেন যে, 'তাদের ঈমান তখন পূর্ণাঙ্গ থাকে না," তাহলে এতে কোন শক্তি ও প্রভাব থাকত না এবং হাদীস দ্বারা ভীতি প্রদর্শনের যে উদ্দেশ্য ছিল সেটাই নষ্ট হয়ে যেত। একটু আগেই এ হাদীসটি গিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অধিকাংশ ভাষণ ও বক্তৃতায় এ কথাটি বলতেন ঃ "যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই, আর যার মধ্যে প্রতিজ্ঞা পালনের মনোবৃত্তি নেই, তার মধ্যে দ্বীন নেই।" এখন যদি এর স্থলে স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হত যে, "যার মধ্যে আমানতদারী নেই, সে পূর্ণ মু'মিন নয়, আর যার মধ্যে প্রতিজ্ঞাপালনের মনোবৃত্তি নেই, সে পূর্ণ দ্বীনদার নয়।" তাহলে এতে ঐ শক্তি ও প্রভাব মোটেই থাকত না, যা হাদীসের বর্তমান শব্দমালায় রয়েছে। যা হোক, দাওয়াত, উপদেশ দান এবং ভীতি প্রদর্শন— যা এ হাদীসমূহের উদ্দেশ্য এর জন্য এ বাকপদ্ধতিই সঠিক ও অধিক উপযোগী।

অতএব, এ হাদীসগুলোকে 'কুফরীর ফতওয়া' অথবা ফেকাহর 'আইনগত বিধান' মনে করা এবং এর ভিত্তিতে এসকল গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেওয়া (যেমন, মু'তাযেলা ও খারেজী সম্প্রদায় এমনটিই করেছে,) প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসের উদ্দেশ্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাক-রীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন না করারই ফল।

কয়েকটি মুনাফেকসুলভ কর্ম ও চরিত্র

(٥٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَّمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ اِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ * (رواه البخارى ومسلم)

৫২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি এমন স্বভাব রয়েছে যে, যার মধ্যে এ চারটিরই সমাবেশ ঘটে, সে নির্ভেজাল মুনাফেক। আর যার মধ্যে এ চারটির মধ্য থেকে কোন একটি স্বভাব পাওয়া যায়, তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে এটা ছেড়ে দেয় ঃ (১) আমানতের রক্ষক হলে সে খেয়ানত করে। (২) যখনই কথা বলে, মিথ্যা বলে। (৩) যখনই প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি করে, তা ভেঙ্গে ফেলে। (৪) যখনই কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে, তখনই গালি-গালাজ করে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃত মুনাফেকী তো মানুষের সেই নিকৃষ্টতর অবস্থার নাম যে, সে অন্তর দ্বারা ইসলামকে গ্রহণ করে না; কিন্তু কোন কারণে মৌখিকভাবে নিজেকে মুমিন বা মুসলিম বলে প্রকাশ করে। যেমন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুনাফেকদের অবস্থা ছিল। এই মুনাফেকী প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্টতর কুফ্‌রী। এই মুনাফেকদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ "নিশ্চয়ই, মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে।" —সূরা নিসা। কিন্তু কতগুলো খারাপ স্বভাব ও মন্দ চরিত্রও এমন রয়েছে, যেগুলোর সাথে ঐ মুনাফেকদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে এবং আসলে এগুলো তাদেরই অভ্যাস ও চরিত্র। কোন মুসলমানের মধ্যে এগুলোর ছায়াও না পড়া উচিত। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে কোন মুসলমানের মধ্যে যদি এমন কোন অভ্যাস ও স্বভাব পাওয়া যায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, তার মধ্যে এ মুনাফেকসুলভ অভ্যাসটি রয়েছে। আর কারো মধ্যে যদি মুনাফেকদের সকল স্বভাবেরই সমাবেশ ঘটে যায়, তখন মনে করতে হবে যে, চরিত্রের দিক দিয়ে এ লোকটি পূর্ণ মুনাফেক।

সারকথা, একটি মুনাফেকী তো ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যা নিকৃষ্টতর কুফরী। কিন্তু এ ছাড়াও কোন মানুষের চরিত্র মুনাফেকদের চরিত্রের ন্যায় হয়ে যাওয়াও এক ধরনের মুনাফেকী। তবে সেটা আকীদাগত মুনাফেকী নয়; বরং চরিত্র ও কর্মের মুনাফেকী। একজন মুসলমানের জন্য যেভাবে কুফর, শিরক ও আকীদাগত মুনাফেকী থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, তেমনিভাবে মুনাফেকসুলভ চরিত্র এবং মুনাফেকসুলভ কর্মকাণ্ড থেকেও নিজেকে হেফাযত করা জরুরী।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফেকী স্বভাবসমূহের মধ্য থেকে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন ঃ (১) খেয়ানত, (২) মিথ্যা, (৩) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা এবং (৪) গালিগালাজ ও কটু কথা বলা। তিনি এও বলে দিয়েছেন যে, যার মধ্যে এই স্বভাবসমূহের একটিও পাওয়া যাবে, মনে করতে হবে যে, তার মধ্যে একটি মুনাফেকী স্বভাব রয়েছে। আর

যার মধ্যে এই চারটিরই সমাবেশ ঘটবে, সে নিজের চরিত্র পরিচয়ে নির্ভেজাল মুনাফেক হিসাবে পরিচিত হবে।

(٥٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ * (رواه مسلم)

৫৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মারা গেল যে, সে জেহাদ করেনি এবং জেহাদের বাসনাও অন্তরে পোষণ করেনি, সে মুনাফেকীর একটি চরিত্রের উপর মারা গেল। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এমন জীবন, যেখানে ঈমানের দাবী সত্ত্বেও জেহাদের পালাও আসে না এবং জেহাদের প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষাও অন্তরে থাকে না, এটা হচ্ছে মুনাফেকদের জীবন। যে ব্যক্তি এ অবস্থা নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, সে মুনাফেকীর একটি চরিত্র নিয়েই বিদায় নেবে।

(٥٤) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا * (رواه مسلم)

৫৪। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এটা হচ্ছে মুনাফেকের নামায, অলসভাবে বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে যখন এটা হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং অস্তমিত হওয়ার সময় এসে যায়, তখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং পাখীর মত চারটি ঠোকর মেরে শেষ করে দেয়। আর এতে আল্লাহ্র যিকির খুব কমই করে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হচ্ছে, মুসলমানের অবস্থা তো এমন হওয়া চাই যে, উৎসাহ উদ্দীপনা ও অস্থিরতা নিয়ে সে নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকবে এবং সময় হয়ে গেলে আগ্রহ ও প্রস্তুতির সাথে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। সে এই চিন্তা করবে যে, এখন আমি রাজাধিরাজের মহান দরবারে উপস্থিত হচ্ছি। তাই সে পূর্ণ স্থিরতা ও বিনয়ভাব নিয়ে নামায আদায় করবে এবং দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং রুকূ, সেজদায় আল্লাহ্কে ভাল করে স্মরণ করবে এবং এর দ্বারা নিজের অন্তরকে আনন্দ দান করবে। পক্ষান্তরে মুনাফেকদের অবস্থা এ হয়ে থাকে যে, নামায তাদের জন্য মাথার বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং সময় হয়ে গেলেও এটাকে বিলম্বিত করতে থাকে। যেমন, আসরের নামাযের জন্য তারা এমন সময় উঠে, যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার একেবারে কাছাকাছি সময়ে পৌঁছে যায়। আর তারা পাখীর মত চারটি ঠোকর মেরে নামায শেষ করে দেয়, এতে আল্লাহ্র নামও তারা নামেমাত্র নিয়ে থাকে। অতএব, এটা হচ্ছে মুনাফেকের নামায। যে কেউ এ ধরনের নামায পড়বে, সেটা খাঁটি মু'মিনদের নামায হবে না; বরং সে যেন মুনাফেকের নামাযই পড়ল।

(٥٥) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَهُ الْاَذَانُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ * (رواه ابن ماجة)

৫৫। হযরত ওছমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে অবস্থানরত থাকে এমতাবস্থায় আযান হয়ে যায়, তারপরও সে যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় এবং নামাযে শরীক হওয়ার জন্য ফিরে আসার ইচ্ছাও না রাখে, তাহলে সে হচ্ছে মুনাফেক। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম হলো, এটা হচ্ছে মুনাফেকসুলভ কাজ। তাই এমন ব্যক্তি আকীদার ক্ষেত্রে মুনাফেক না হলেও 'কার্যক্ষেত্রে মুনাফেক' হবে।

মনে ওয়াসওয়াসা আসা ঈমানের পরিপন্থী নয়
এবং এর জন্য শাস্তিও হবে না

(٥٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَا وَسْوَسَتْ بِهٖ صَدْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اَوْ تَتَكَلَّمْ * (رواه البخارى و مسلم)

৫৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের অন্তরে আবর্তিত কুচিন্তা ও ওয়াসওয়াসার বিষয়টি মাফ করে দিয়েছেন— যে পর্যন্ত এগুলো কার্যে পরিণত অথবা মুখে উচ্চারণ না করা হয়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের মনে অনেক সময় খুবই খারাপ চিন্তা ও ভাব জাগ্রত হয় এবং কোন কোন সময় অবিশ্বাসী ও নাস্তিকসুলভ প্রশ্ন এবং আপত্তি মানুষের মস্তিষ্ককে অস্থির করে ফেলে। এ হাদীসে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, এসব কুচিন্তা ও ওয়াসওয়াসা যে পর্যন্ত ওয়াসওয়াসার পর্যায়েই থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এর উপর কোন শাস্তি দেয়া হবে না। হ্যাঁ, যখন এসব কুচিন্তা ওয়াসওয়াসার পর্যায় অতিক্রম করে কর্ম ও কথায় পরিণত হয়ে যাবে, তখন এগুলোর উপর অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে।

(٥٧) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ اُحَدِّثُ نَفْسِىْ بِالشَّيْئِ لِاَنْ اَكُوْنَ حُمَمَةً اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهٖ، قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اَمْرَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ * (رواه ابوداؤد)

৫৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল ঃ আমার মনে কখনো কখনো এমন কুচিন্তা আসে যে, এগুলো মুখে আনার চেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র শুকরিয়া, যিনি বিষয়টিকে ওয়াসওয়াসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। —আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, এটা দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার কোন বিষয় নয়; বরং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় কর যে, তাঁর অপার অনুগ্রহ তোমার অন্তরকে এসব কুচিন্তা ও মন্দভাব বাস্তবে পরিণত করা থেকে রক্ষা করেছে এবং এই ব্যাপারটাকে ওয়াসওয়াসার পর্যায় থেকে সামনে অগ্রসর হতে দেয়নি।

(৫৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلُوْهُ اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ اَوَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ ؟ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ * (رواه مسلم)

৫৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁর খেদমতে এসে আরয করলেন ঃ অনেক সময় আমরা নিজেদের অন্তরে এমন কথা ও কল্পনা অনুভব করি, যা মুখে আনাও আমরা গুরুতর অন্যায় মনে করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বাস্তবিকই তোমরা এটাকে গুরুতর অন্যায় মনে কর ? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমাদের অবস্থা তো তাই। তখন তিনি বললেন ঃ এটা তো স্পষ্ট ঈমান। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, কারো অন্তরে যখন এই অবস্থা বিরাজ করে যে, দ্বীন ও শরীঅতের খেলাফ কোন ওয়াসওয়াসা আসলেও সে ঘাবড়ে যায় এবং এটা মুখে উচ্চারণ করতেও ভয় পায়, তখন ধরে নিতে হবে যে, এটা খাঁটি ঈমানেরই লক্ষণ।

(৫৯) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ * (رواه البخارى ومسلم)

৫৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো নিকট শয়তান এসে জিজ্ঞাসা করে, এই জিনিসটি কে সৃষ্টি করেছে ? অমুক জিনিসটি কে সৃষ্টি করেছে ? এমনকি সে বলে যে, (প্রত্যেক বস্তুরই যখন কোন সৃষ্টিকারী থাকে তাহলে বল,) আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে ? অতএব, প্রশ্নের পর্ব যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন যেন বান্দা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং ক্ষান্ত হয়ে যায়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, এ জাতীয় ওয়াসওয়াসা এবং প্রশ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষের অন্তরে আসে। তাই শয়তান যখন কারো অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এ ধরনের মূর্খতাপ্রসূত প্রশ্ন সৃষ্টি করে দেয়, তখন এর সহজ চিকিৎসা এটাই যে, বান্দা শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং এ দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেবে। অর্থাৎ, এ বিষয়টিকে মনোযোগ দেওয়ার মত কোন ব্যাপার ও চিন্তাশক্তি ব্যয় করার মত কোন বিষয়ই মনে করবে না।

(٦٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ * (رواه البخارى ومسلم)

৬০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ সর্বদা অহেতুক প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি তাদের মুখে এ কথাও আসবে যে, সকল মাখলুককে তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে ? তাই যে ব্যক্তি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়, সে যেন এ বলে কথা শেষ করে দেয় যে, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। —বুখারী ও মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম হচ্ছে, মু'মিনের নীতি এসব প্রশ্ন ও ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্রে এ হওয়া চাই যে, সে প্রশ্নকারী ব্যক্তি অথবা কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তান অথবা নিজের মনকে পরিষ্কারভাবে বলে দেবে যে, আমার অন্তরে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমানের জ্যোতি বিদ্যমান। তাই এ প্রশ্নটি আমার কোন চিন্তারই বিষয় নয়। যেমন, কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির জন্য এ প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর যে, সূর্যে আলো আছে কি না ?

ঈমান ও ইসলামের সারবস্তু

(٦١) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلاً لاَ اَسْأَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ (وَفِى رِوَايَةٍ غَيْرَكَ) قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ * (رواه مسلم)

৬১। হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ্ সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন কথা বলে দিন যে, আপনার পরে এ বিষয়ে অন্য কারো কাছে আমার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না পড়ে। তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি বল, আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম। তারপর তুমি এতে অবিচল থাক। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্কে নিজের মাবূদ ও রব মেনে নিয়ে নিজেকে কেবল তাঁরই বন্দেগী ও আনুগত্যে সমর্পণ করে দাও। তারপর এ ঈমান ও নিজের দাসত্বের দাবীসমূহ যথাযথ পূরণ করে নিজের জীবন পরিচালনা কর, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

এ হাদীসটি 'অল্প কথায় অধিক মর্ম প্রকাশকারী' বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের এ দু'টি শব্দে ইসলামের সম্পূর্ণ সারবস্তু এসে গিয়েছে। আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও এর উপর অবিচল থাকাই ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; বরং এটাই ইসলামের প্রাণ। আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখার মর্ম তো কিতাবের শুরুতে হাদীসে জিবরাঈলের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর 'এস্তেকামাত' তথা অবিচলতার অর্থ হচ্ছে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি এবং কোন ধরনের ত্রুটি ও অবহেলা এবং কোন প্রকার বক্রতা ও বিপথগমন ছাড়া আল্লাহ্র মনোনীত সিরাতে মুস্তাকীম-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং যথাযথ এর অনুসরণ করে যাওয়া। এক কথায় শরীঅতের সকল বিধি-নিষেধ এবং আল্লাহ্র সমস্ত আহ্কামের সঠিক, পরিপূর্ণ এবং সার্বক্ষণিক অনুসরণের নাম এস্তেকামাত তথা দ্বীনের ব্যাপারে অবিচল। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বান্দার জন্য এর চেয়ে উচ্চতর আর কোন অবস্থান ও মর্যাদা হতে পারে না। এ জন্যই সূফী-সাধকগণ বলেছেন ঃ "এস্তেকামাত তথা দ্বীনের ক্ষেত্রে অবিচলতা হাজারো কারামতের চেয়ে উত্তম।"

যাহোক, 'এস্তেকামাত' এমন জিনিস যে, এর শিক্ষা গ্রহণের পর আর কোন পাঠ গ্রহণের প্রয়োজন থাকে না; বরং এটাই মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কুরআন মজীদেও কয়েক স্থানে মানুষের সৌভাগ্য ও সফলতাকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও এস্তেকামাতের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি আয়াতের মর্ম এই ঃ "নিশ্চয়, যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, তারপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী এবং নিজেদের কর্মের প্রতিদান হিসাবে তারা চিরকাল সেখানেই থাকবে।" —সূরা আহ্‌কাফ

অতএব, বলা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবতঃ এসব আয়াতের আলোকেই সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহকে এ উত্তর দিয়েছিলেন।

(٦٢) عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ" قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ * (رواه مسلم)

৬২। হযরত তামীম দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দ্বীন হচ্ছে কল্যাণকামিতা, আন্তরিকতা ও বিশ্বাস রক্ষা করার নাম। আমরা আরয করলাম, কার প্রতি আন্তরিকতা ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃবৃন্দের প্রতি এবং তাদের সাধারণ মানুষের প্রতি। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটিও 'কম কথায় অধিক মর্ম প্রকাশকারী' বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম নববী (রহঃ) লিখেছেন যে, এ হাদীসটি দ্বীনের সকল বিষয়ের উপর পরিব্যাপ্ত, আর এর উপর আমল করা যেন দ্বীনের সকল অভিপ্রায়কেই বাস্তবায়িত করার শামিল। কেননা, দ্বীনের কোন বিভাগ এবং কোন দিক এমন নেই, যা এ হাদীসের বিষয়বস্তু থেকে বাদ রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এ হাদীসটির মধ্যে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র কিতাব, আল্লাহ্‌র রাসূল, উম্মতের ইমাম ও নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন এবং তাদের সাথে বিশ্বাস রক্ষাকে দ্বীন বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে পূর্ণ দ্বীন। কেননা, আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন ও বিশ্বাস রক্ষার মর্ম হচ্ছে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন, সম্ভাব্য পর্যায় পর্যন্ত তাঁর পরিচয় ও মা'রেফাত লাভ করা, তাঁর সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভালবাসা রাখা, তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করা, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা, তাঁকে মালিক ও ক্ষমতাধর মনে করে ভয় করা। এক কথায় পূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সাথে গোলামীর দাবী পূরণ করা।

আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে আন্তরিকতা ও বিশ্বাস রক্ষার মর্ম হচ্ছে এর উপর ঈমান আনা। তার মাহাত্ম্যের দাবী পূরণ করা, এর জ্ঞান লাভ করা এবং এর প্রচার প্রসার করা এবং এর উপর আমল করা। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আন্তরিকতা ও তাঁর সাথে বিশ্বাস রক্ষার মর্ম হচ্ছে, তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করা, সম্মান ও ভক্তি করা, তাঁর প্রতি, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ এবং সুন্নতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং মনে-প্রাণে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণকেই নাজাত ও মুক্তির ওসীলা মনে করা।

মুসলমানদের ইমাম, শাসক এবং পথপ্রদর্শকদের প্রতি আন্তরিকতা ও বিশ্বাস রক্ষার অর্থ হচ্ছে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা। তাদের পক্ষ থেকে কোন উদাসীনতা এবং ভুল প্রকাশ পেলে সুন্দর পদ্ধতিতে এর সংশোধনের চেষ্টা করা, ভাল পরামর্শ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করা এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত নির্দেশাবলী মেনে নেওয়া।

মুসলমান জনসাধারণের প্রতি আন্তরিকতা ও বিশ্বাস রক্ষার মর্ম হচ্ছে, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও তাদের কল্যাণকামিতার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা। তাদের লাভকে নিজের লাভ এবং তাদের ক্ষতিকে নিজের ক্ষতি মনে করা। বৈধ ও সম্ভাব্য খেদমত ও সাহায্য করতে কুণ্ঠিত না হওয়া। সারকথা, তাদের স্তর বিবেচনায় যেখানে যে হক ও অধিকার নির্ধারিত, সেসব হক আদায় করে যাওয়া। যেমন, সম্মানের স্থলে সম্মান প্রদর্শন করা, স্নেহের ক্ষেত্রে স্নেহদান করা, খেদমতের ক্ষেত্রে খেদমত করে যাওয়া এবং সাহায্যের প্রয়োজনে সাহায্য করা।

এ বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝে নিতে পারে যে, এ হাদীসটি সম্পূর্ণ দ্বীনকে কিভাবে পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ সংক্ষিপ্ত শব্দমালায় দ্বীনের প্রতিটি বিভাগের আলোচনা কি সুন্দরভাবে করে দেওয়া হয়েছে। এ কথাটিও বুঝে নেওয়া যায় যে, এই হাদীসটির উপর সঠিকভাবে আমল করলে সম্পূর্ণ দ্বীনের উপরই আমল হয়ে যায়।

তকদীরকে স্বীকার করাও ঈমানের অপরিহার্য শর্ত

হাদীসে জিবরাঈলের আনুষাঙ্গিক আলোচনায় এবং অন্যান্য কতিপয় হাদীসের ব্যাখ্যায়ও তকদীর প্রসঙ্গে পূর্বেই কিছুটা আলোচনা হয়ে গিয়েছে এবং মোটামুটি একথাটি জানা হয়ে গিয়েছে যে, তকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখানে পৃথকভাবে তকদীর সম্পর্কীয় কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করা হবে। যেগুলোর দ্বারা এই বিষয়টির গুরুত্ব ও এর কিছুটা বিস্তারিত ব্যাখ্যাও জানা যাবে।

(٦٣) عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيْ قَالَ اَتَيْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهٗ قَدْ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ شَيْءٌ مِنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُذْهِبَهٗ مِنْ قَلْبِىْ، فَقَالَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوَاتِهٖ وَاَهْلَ اَرْضِهٖ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهٗ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ اَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَ اَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ اَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ اَتَيْتُ زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَالِكَ * (رواه احمد و ابوداؤد و ابن ماجة)

৬৩। ইবনে দায়লামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম ঃ তকদীরের বিষয়ে আমার অন্তরে কিছুটা প্রশ্নের মত সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে আপনি কিছু বর্ণনা করুন, যাতে আমার অন্তরের এ ভাব আল্লাহ্ তা'আলা দূর করে দেন। উবাই ইবনে কা'ব তখন বললেন ঃ শুন! যদি আল্লাহ্

তা'আলা আসমান-যমীনের সকল অধিবাসীকে আযাবে নিক্ষেপ করেন, তাহ্লেও তিনি এ কাজে যালেম হবেন না। আর তিনি যদি এদের সবাইকে দয়ায় ধন্য করেন, তাহলে তাঁর এ দয়া তাদের কর্মের চেয়ে অনেক উত্তম হবে। (অর্থাৎ, এটা তাদের কর্মের প্রাপ্য প্রতিদান হবে না; বরং একান্তই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ বিবেচিত হবে।) আরো শুন! তুমি যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তাহলে সেটাও আল্লাহ্ তোমার পক্ষ থেকে গ্রহণ করবেন না, যে পর্যন্ত তুমি তকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং যে পর্যন্ত তুমি এ দৃঢ় বিশ্বাস না করবে যে, যা তোমার ভাগ্যে জুটেছে সেটা হাতছাড়া হবার ছিল না এবং যা ছুটে গিয়েছে সেটা তোমাকে ধরা দেওয়ার ছিল না। (অর্থাৎ, যাকিছু হয় সেটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত এবং এ ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন সম্ভব নয়।) তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও, তাহলে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। ইবনে দায়লামী বলেন ঃ তারপর আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনিও আমাকে এ কথাই বললেন। এরপর আমি হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনিও এ কথাই বললেন। শেষে আমি যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাত দিয়ে আমাকে এ কথাই বললেন। —মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ তকদীরের ব্যাপারে একটি সাধারণ কুমন্ত্রণা যা শয়তান কখনো কখনো ঈমানদারদের অন্তরেও সৃষ্টি করে থাকে সেটা এই যে, যখন সবকিছুই আল্লাহ্র তরফ থেকে হয়, তাহলে দুনিয়াতে কেউ ভাল অবস্থায় এবং কেউ খারাপ অবস্থায় কেন ? তারপর আখেরাতে আবার কাউকে জান্নাতে, আর কাউকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে কেন ? যদি কোন ঈমানদারের অন্তরে কখনো এ ওয়াসওয়াসা আসে, তাহলে এটা দূর করার সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায় হচ্ছে এই যে, বিশ্ব জগতের স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলার তার বান্দাদের উপর এবং সকল সৃষ্টির উপর যে অধিকার রয়েছে, সে কথাটি নতুন করে স্মরণ করবে এবং এ চিন্তা করবে যে, এমন একচ্ছত্র ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তা, যিনি সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, সেই খালেক-মালেক আল্লাহ্ নিজের যে সৃষ্টির সাথে যে ব্যবহার করেন, নিঃসন্দেহে তিনি এর হকদার। সৃষ্টির বেলায় মহান আল্লাহ্র এ বিশেষ অধিকারের কথাটি যদি মনে গেঁথে নেয়া হয়, তাহলে মু'মিনের অন্তর থেকে এ সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে এবং মনে প্রশান্তি এসে যাবে।

ইবনে দায়লামী আল্লাহ্র রহ্মতে খাঁটি মু'মিন ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার এ অধিকার ও শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই ঐসব সাহাবায়ে কেরাম এ কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর মনের ওয়াসওয়াসা দূরীভূত করলেন এবং এটাও বলে দিলেন যে, তকদীরের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা এতই জরুরী যে, কোন ব্যক্তি যদি এই বিশ্বাস ছাড়া পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেয়, তবু আল্লাহ্র দরবারে তা গৃহীত হবে না এবং তার ঠিকানা জাহান্নামই হবে।

তবে এখানে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, এ পদ্ধতিতে কেবল ঈমানদারদের এ ধরনের ওয়াস্ওয়াসার চিকিৎসা করা যেতে পারে। অন্যান্য লোকদের পক্ষ থেকে তকদীরের ব্যাপারে যেসব সংশয় ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় সেগুলোর উত্তরের পন্থা ভিন্ন। সেটা জানার জন্য 'কালাম শাস্ত্রে'র কিতাবাদির সাহায্য নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ সামনের পৃষ্ঠাগুলোতেও করা হবে।

(٦٤) عَنْ اَبِىْ خِزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوِىْ بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ قَالَ هِىَ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ * (رواه احمد والترمذى وابن ماجة)

৬৪। আবূ খিযামা সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বলুন তো! ঝাড়-ফুঁকের যেসব পদ্ধতি আমরা কোন কষ্ট ও অনিষ্টের ক্ষেত্রে অবলম্বন করে থাকি, যেসব ঔষধ-পথ্য আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করি এবং যেসব তাবীয-তদবীর আমরা আত্মরক্ষার জন্য গ্রহণ করে থাকি এগুলো কি আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরকে খণ্ডন করে দিতে পারে ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ এগুলোও তো আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরেরই অন্তর্ভুক্ত। —মুসনাদে আহ্মাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারসংক্ষেপ এই যে, আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সকল তদবীর ও চেষ্টা-সাধনা করে থাকি এবং এ পর্যায়ে যে সব উপকরণ আমরা ব্যবহার করে থাকি, সেগুলোও আল্লাহ্র ফায়সালা ও তকদীরেরই অধীন। বিষয়টি এরকম যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই এটা নির্ধারিত থাকে যে, অমুক ব্যক্তির উপর রোগ-ব্যাধি আসবে, আর সে অমুক ধরনের ঝাড়-ফুঁক অথবা অমুক ঔষধ ব্যবহার করে সুস্থ হয়ে যাবে। চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অতি সংক্ষিপ্ত দুই শব্দের উত্তর দ্বারা তকদীর প্রসঙ্গে অনেক সংশয় ও প্রশ্নের নিরসন হয়ে যায়।

(٦٥) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ "فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى * وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى * (رواه البخارى ومسلم)

৬৫। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। (অর্থাৎ, জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যে যেখানে যাবে, তার সে ঠিকানা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে।) সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে কি আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির উপর ভরসা করে বসে থাকব না ? এবং আমল ও সাধনা ছেড়ে দেব না ? (অর্থাৎ, সবকিছুই যখন পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তখন চেষ্টা-সাধনার এ কষ্ট কেন করব ?) তিনি উত্তর দিলেন ঃ না, তোমরা আমল করে যাও। কেননা, সবাইকে সে কাজের তওফীকই দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, তাকে ভাগ্যবান মানুষের কাজ করার তওফীক দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগা, তাকে দুর্ভাগা মানুষের মন্দ কাজেরই তওফীক দেওয়া হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যার মর্ম এই ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে দান করল, তাক্‌ওয়া অবলম্বন করল এবং উত্তম বিষয়কে স্বীকার করে নিল, (অর্থাৎ, ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নিল,) আমি তাকে শান্তি-সুখের জীবন অর্থাৎ জান্নাত লাভের তওফীক দেব। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা প্রদর্শন করল, বেপরওয়াভাব প্রদর্শন করল এবং উত্তম বিষয় তথা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল, আমি তার জন্য কষ্টের জীবন (অর্থাৎ, জাহান্নামের পথে চলা) সহজ করে দেব।" —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারবস্তু এই যে, যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার শেষ ঠিকানা জাহান্নাম অথবা জান্নাতে লিখে রাখা হয়েছে, কিন্তু ভাল অথবা মন্দ কর্ম দ্বারা সেখানে পৌছার পথও পূর্ব থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীরে এটাও ফায়সালা করে রাখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, সে তার এ এ সৎকর্মের পথ ধরে যাবে। আর যে জাহান্নামে যাবে, সে তার এ এ অসৎকর্মের ফলে যাবে। তাই জান্নাতীদের জন্য সৎকর্ম এবং জাহান্নামীদের জন্য অসৎকর্মও ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং এজন্যই মানুষ এগুলো করে থাকে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উত্তরের সারবস্তু প্রায় তাই, যা উপরের হাদীসের উত্তরে ছিল। এই বিষয়ের কিছুটা স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা একটু পরেই করা হবে।

(٦٦) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزَ وَالْكَيْسَ – (رواه مسلم)

৬৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিস তকদীর অনুসারেই হয়। এমনকি কোন মানুষের অকর্মন্য ও অযোগ্য হওয়া এবং কোন মানুষের যোগ্য ও জাগ্রত চেতনার অধিকারী হওয়া উভয়টিই তকদীরের ফায়সালার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মানুষের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা তার কর্ম-দক্ষতা ও অকর্মন্যতা এবং বুদ্ধিমত্তা ও বুদ্ধিহীনতা ইত্যাদি গুণাবলীও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীরের ভিত্তিতেই লাভ হয়ে থাকে। মোটকথা, এ দুনিয়াতে যে যেমন ও যে অবস্থায় আছে, সেটা আল্লাহ্‌র ফায়সালা ও তকদীরেরই অধীন।

(٦٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَّ تَنَازَعُوْا فِيْهِ * (رواه الترمذى)

৬৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার আমরা (মসজিদে নবভীতে বসে) তকদীর প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তশরীফ আনলেন এবং আমাদেরকে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত দেখে খুবই রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারা এমন লাল হয়ে গেল যে, মনে হচ্ছিল, কেউ যেন তাঁর দুগন্ডে আনারের দানা নিংড়িয়ে দিয়েছে। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে কি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, না আমি তোমাদের নিকট এ জন্য প্রেরিত হয়েছি (যে, তোমরা তকদীরের মত নাজুক বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করবে।) তোমাদের পূর্বের উম্মতরা তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তারা তকদীরের বিষয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছিল। আমি তোমাদেরকে শপথ দিয়ে বলছি, আবারও শপথ দিয়ে বলছি, এ বিষয়ে তোমরা কখনো বিতর্কে লিপ্ত হতে যেয়ো না। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ তকদীরের বিষয়টি আসলেই খুবই কঠিন ও স্পর্শকাতর বিষয়। তাই মু'মিন ব্যক্তির উচিত, যদি এই বিষয়টি তার বুঝে না আসে, তাহলে বাদানুবাদ করতে যাবে না; বরং নিজের মন-মস্তিষ্ককে এ বলে শান্ত করে নেবে যে, আল্লাহ্র সত্য নবী এ বিষয়টি এভাবেই বর্ণনা করেছেন, তাই আমরা এর উপর ঈমান এনেছি।

তকদীরের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার গুণের সাথে সম্পর্কিত। তাই এটা কঠিন ও স্পর্শকাতর হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের অবস্থা তো এই যে, এ দুনিয়ারই অনেক বিষয় এবং অনেক রহস্য আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝে না। অতএব, আল্লাহ্র সত্য নবী যখন একটি বাস্তব বিষয় বর্ণনা করেছেন– যা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সবার জন্য সহজ নয়, তাই যাদের উপলব্ধিতে এটা না আসে, তাদের জন্যও ঈমান আনার পর সঠিক কর্মপদ্ধতি এটাই যে, তারা এ বিষয়ে কোন বিতর্ক ও হঠকারিতায় যাবে না; বরং নিজেদের জ্ঞান ও উপলব্ধির অক্ষমতার কথা স্বীকার করে এর উপর ঈমান নিয়ে আসবে।

বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভীষণ রাগের কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, এসব সাহাবায়ে কেরাম তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষার অধীনে ছিলেন এবং সরাসরি তাঁর নিকট থেকে দ্বীন হাছিল করে যাচ্ছিলেন। তাই তাদেরকে তিনি যখন এ বিতর্কে লিপ্ত দেখলেন, তখন একজন সুহৃদ শিক্ষক ও দীক্ষাগুরুর যেমন এই অবস্থায় রাগ এসে যায়, তেমনি তাঁরও রাগ এসে গিয়েছিল।

এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন ঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তারা তকদীরের ব্যাপারে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল।" এখানে উম্মতদের ধ্বংসের অর্থ সম্ভবতঃ তাদের পথভ্রষ্টতা। কুরআন ও হাদীসে 'ধ্বংস' শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে পথভ্রষ্টতার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ হিসাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার অর্থ এ হবে যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে আকীদাগত গোমরাহী তখনই এসেছে, যখন তারা এ প্রসঙ্গটিকে তর্ক-বিতর্কের বিষয়বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষী যে, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও আকীদাগত গোমরাহীর ধারা এ বিষয় থেকেই শুরু হয়েছে। এখানে এ বিষয়টিও ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, এ হাদীসে তকদীরের ব্যাপারে বাদানুবাদ ও হঠকারিতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি তকদীরের ব্যাপারে একজন মু'মিনের মত নিশ্চিত বিশ্বাস রেখে কেবল মনের প্রশান্তির জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহলে এতে কোন বাধা নেই। এর পূর্বের দু'টি হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরেই এ প্রসঙ্গের কয়েকটি দিক নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

(٦٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ * (رواه مسلم)

৬৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সকল সৃষ্টির তকদীর লিখে রেখেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তখন আল্লাহ্র আরশ ছিল পানির উপর। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথম বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তকদীর লিখার অর্থ কি ? এটা তো স্পষ্ট যে, এর অর্থ এ নয় যে, আমরা যেভাবে হাতে কলম নিয়ে কাগজে অথবা শ্লেটে কিছু লিখে থাকি, আল্লাহ্ তা'আলাও সেইভাবে লিখেছেন। এমন ধারণা করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র পবিত্র শান ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

আসলে আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম ও গুণাবলীর স্বরূপ ও অবস্থা অনুধাবন করতে আমরা অপারগ। কিন্তু যেহেতু এর জন্য পৃথক কোন ভাষা ও শব্দ নেই, এই জন্য আমরা বাধ্য হয়ে ঐসকল শব্দমালা দিয়েই তাঁর কাজ ও গুণাবলী উপস্থাপন করি, যেগুলো আমাদের কাজ ও অবস্থা প্রকাশের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে। অন্যথায় তাঁর এবং আমাদের কর্ম ও অবস্থার স্বরূপের মধ্যে এতটুকুই পার্থক্য রয়েছে, যতটুকু পার্থক্য রয়েছে তাঁর মহান সত্তা ও আমাদের সত্তার মধ্যে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, এই হাদীসে তকদীর লিখার যে কথা বলা হয়েছে, এর স্বরূপ ও ধরন কি ?

এছাড়া এটাও এক বাস্তব বিষয় যে, আরবী ভাষায় কোন জিনিসের ফায়সালা ও নির্ধারণকেও 'লিখে দেওয়া' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন, কুরআন মজীদে এই অর্থেই বলা হয়েছে যে, "তোমাদের উপর রোযা লিখে দেওয়া হয়েছে" অর্থাৎ, ফরয করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কেসাস সংক্রান্ত আয়াতেও বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের উপর কেসাস লিখে দেওয়া হয়েছে।" অথচ উভয়স্থলেই অর্থ হচ্ছে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাই এ হাদীসেও যদি লিখে দেওয়ার অর্থ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাহলে অর্থ হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সকল সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যা হবার তা ঠিক করে দিয়েছেন। এ অর্থের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ এটাও যে, কোন কোন বর্ণনায় 'লিখে দিয়েছেন'-এর স্থলে 'নির্ধারণ করে দিয়েছেন' শব্দও এসেছে।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, 'ভাগ্যনির্ধারণ' সংক্রান্ত কোন কোন অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে 'কলম' এবং 'লওহ' সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা উদ্ধৃত করা হয়েছে, এগুলো 'ইসরাঈলী' রেওয়ায়াত থেকে সংগৃহীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে এর কোন উল্লেখই নেই।

এ হাদীসের ব্যাপারে দ্বিতীয় যে কথাটি মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই যে, এখানে পঞ্চাশ হাজার বছর দ্বারা সুদীর্ঘকাল বুঝানোও উদ্দেশ্য হতে পারে। আরবী ভাষা এবং আরবী বাক-রীতিতে এ ধরনের ব্যবহার খুবই প্রচলিত রয়েছে।

হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ 'তখন আল্লাহ্র আরশ ছিল পানির উপর।' এতে বুঝা যায় যে, ঐ সময় আরশ এবং পানি সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) লিখেছেন ঃ আমাদের ধারণশক্তি ও মস্তিষ্কে যেরূপ হাজার হাজার জিনিসের চিত্র অংকিত ও এগুলোর জ্ঞান সঞ্চিত থাকে, তদ্রূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আরশের কোন বিশেষ শক্তিতে (যাকে আমাদের ধারণশক্তির সদৃশ মনে করতে হবে) সকল সৃষ্টি এবং তাদের অবস্থা তাদের গতি ও স্থিতি— এক কথায় জগতে যা কিছু ঘটবে, এর সবকিছুই আরশের ঐ শক্তিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে দিয়েছেন। তাই বলা যায়, দুনিয়ার যবনিকার অন্তরালে যা কিছু ঘটছে, এর সব কিছুই আরশের ঐ শক্তিতে এভাবেই বর্তমান ও সংরক্ষিত রয়েছে, যেভাবে আমাদের ধারণশক্তিতে লক্ষ লক্ষ চিত্র এবং এগুলোর জ্ঞান সংরক্ষিত থাকে। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ)-এর নিকট তকদীর ও ভাগ্য লিখনের অর্থ এটাই।

(٦٩) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهٗ وَاَجَلَهٗ وَرِزْقَهٗ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَوَالَّذِيْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا * (رواه البخارى ومسلم)

৬৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র সত্য ও অবিসংবাদিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যের আকারে জমা থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঝুলন্ত জমাট রক্ত আকারে থাকে। তার পরের চল্লিশে এটা গোশ্তের পিন্ড আকারে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা চারটি কথা দিয়ে তার কাছে একজন ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন। এ ফেরেশ্তা তার আমল, তার মৃত্যুর সময় ও তার রিযিক লিখে দেয় এবং একথাও লিখে দেয় যে, সে সৌভাগ্যবান না হতভাগা। তারপর এতে রূহ দেওয়া হয়। অতএব, শপথ ঐ সত্তার, যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। কখনো এমন হয় যে, তোমাদের কেউ জান্নাতী মানুষের মত কাজ করতে থাকে। এমনকি তার মাঝে এবং বেহেশ্তের মাঝে কেবল এক হাতের দূরত্ব থেকে যায়। এমন সময় ভাগ্যলিপি অগ্রগামী হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামীদের মত কাজ করতে শুরু করে। ফলে সে জাহান্নামে চলে যায়। (তেমনিভাবে কখনো এমন হয় যে,) তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের মত কাজ করতে থাকে। এমনকি তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে কেবল এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থেকে যায়। এমন সময় ভাগ্যলিপি অগ্রগামী হয়ে যায় এবং সে জান্নাতীদের মত কাজ করতে শুরু করে। ফলে সে জান্নাতে পৌঁছে যায়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে দু'টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। শুরু অংশে মানবসৃষ্টির ঐ সকল স্তরসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, দেহে আত্মার সংযোগ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে স্তরগুলো একটি মানব শিশু অতিক্রম করে আসে। সম্ভবতঃ এ স্তরসমূহের উল্লেখ পরবর্তী বিষয়বস্তুর ভূমিকা হিসাবে করা হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ভাগ্যলিপির কথা আলোচনা করেছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত ফেরেশ্তা আত্মা সংযোজনের সময় প্রত্যেক জন্ম গ্রহণকারী মানুষের জন্য লিখে থাকে। এর মধ্যে মানুষের আমল, আয়ুষ্কাল, রিযিক এবং সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের বিবরণ থাকে। হাদীসটির বিষয়বস্তুর উপস্থাপন দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ উদ্দেশ্য ঐ ভাগ্যলিপি সম্পর্কে একথাটি বলে দেওয়া যে, এটা এমন চূড়ান্ত ও অনড় বিষয় যে, কোন ব্যক্তির ভাগ্যলিপিতে যদি তার ঠিকানা জাহান্নাম লিখা থাকে, তাহলে সে দীর্ঘকাল বেহেশ্তী মানুষের মত পবিত্র জীবন যাপন করে বেহেশতের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও হঠাৎ তার কর্মধারায় পরিবর্তন এসে যায় এবং এমন কাজ করতে শুরু করে, যা তাকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। ফলে সে এ অবস্থায়ই মারা যায় ও জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যায়। এর বিপরীত এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তি ভাগ্যলিপিতে জান্নাতীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জাহান্নামী মানুষের মত জীবন কাটায় এবং জাহান্নামের এত নিকটবর্তী হয়ে যায় যে, তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে কেবল এক হাত দূরত্ব থাকে। কিন্তু হঠাৎ করে সে নিজেকে সামলে নেয় এবং বেহেশতী মানুষের মত সৎকর্ম করতে শুরু করে এবং এ অবস্থায় মারা যায় ও বেহেশ্তে চলে যায়।

এ হাদীসের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, কাউকে পাপাচারে লিপ্ত দেখে তাকে নিশ্চিতভাব জাহান্নামী বলা যাবে না। কে জানে, জীবনের বাকী অংশটুকুতে তার ভূমিকা কি হবে ? অনুরূপভাবে কেউ যদি আজ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সৎ কাজের তওফীক লাভ করে সৎকর্ম সম্পাদন করতে থাকে, তাহলেও তাকে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়; বরং সর্বদা শুভ পরিণতি তথা ঈমানী মৃত্যুর জন্য চিন্তিত থাকা চাই।

(৭০) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ قُلُوْبَ بَنِىْ اٰدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهٗ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ * (رواه مسلم)

৭০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের অন্তরসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে— একই অন্তরের মত। তিনি যেভাবে এবং যে দিকে চান, এগুলোকে ঘুরিয়ে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে অন্তরসমূহের আবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তুমি তোমার আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ একটু আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম ও বৈশিষ্ট্য বুঝার এবং বুঝাবার জন্য যেহেতু পৃথক কোন ভাষা ও শব্দ নেই, তাই বাধ্য হয়ে আল্লাহ্ পাকের শানেও ঐসব শব্দমালা এবং বাকরীতি ব্যবহার করা হয়, যা আসলে মানুষের কর্ম ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের

জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন, এ হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের অন্তরসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মাঝে অবস্থান করে, এর অর্থ এই যে, মানুষের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার এখতিয়ার ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং তিনি যে দিকে চান সেদিকে ঘুরিয়ে দেন। হাদীসের এ বাকরীতিটি ঠিক এরূপ, যেমন আমরা বলে থাকি ঃ অমুক তো সম্পূর্ণ আমার মুঠির ভিতর। এর অর্থ এই যে, সে সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আমাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যে দিকে চান এগুলো ঘুরিয়ে দেন।

উপরের হাদীসগুলো দ্বারা তকদীর সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় জানা গেল ঃ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সকল সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পৃথিবীতে যাকিছু ঘটবে, তিনি সবকিছুই বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছেন।

(২) মানুষ যখন মাতৃগর্ভে থাকে এবং তার উপর তিনটি 'চল্লিশ' অতিক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়োজিত ফেরেশ্তা তার ব্যাপারে চারটি বিষয় লিখে দেয় ঃ তার আয়ুষ্কাল, তার আমল, তার রিযিক এবং তার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য।

(৩) আমাদের অন্তরকেও আল্লাহ্ তা'আলা যে দিকে ইচ্ছা করেন, সে দিকে ঘুরিয়ে দেন।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরের বিভিন্ন স্তর ও প্রকাশস্থল। প্রকৃত এবং আদি তকদীর এসব কিছুর আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ (রহঃ) তকদীরের এই বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়গুলোকে অতি সুন্দর বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছেন। নিম্নে আমরা তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি।

তকদীরের বিভিন্ন পর্যায়

(১) অনাদিকালে যখন আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন কিছুই ছিল না, আসমান, যমীন, পানি, বাতাস, আরশ, কুরসী ইত্যাদি কিছুই যখন সৃষ্টি হয়নি, সে সময়েও পরবর্তীতে সৃষ্ট এ বিশ্ব চরাচরের সবকিছুর পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার ছিল। সে সময়েই তিনি ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমার জ্ঞানের মধ্যে যে পর্যায়ক্রম রয়েছে সে অনুযায়ী আমি বিশ্ব-জগতকে সৃষ্টি করব এবং সেখানে এসব ঘটনা ঘটবে। এক কথায় ভবিষ্যতে অস্তিত্ব গ্রহণকারী এ জগত সম্পর্কে যে বিন্যাস ও পর্যায়ক্রম তাঁর জ্ঞানের মধ্যে ছিল এবং তিনি সেখানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি এসবকে অস্তিত্বে আনব, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণই হচ্ছে তকদীরের প্রথম পর্যায় এবং প্রথম প্রকাশ।

(২) তারপর একটা সময় আসল যখন আরশ এবং পানি সৃষ্টি করা হল, আসমান, যমীন অস্তিত্বে আসেনি; (বরং ৬৮ নং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী আসমান, যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে) এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ঐ অনাদিকালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল সৃষ্টির তকদীর লিখে দিলেন। (যার স্বরূপ হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ)-এর নিকট এই যে, আরশের ধারণক্ষমতায় আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির তকদীর প্রতিবিম্বিত করে দিলেন, আর এভাবে আরশ এ তকদীরের বাহক হয়ে গেল।) এটা হচ্ছে তকদীরের দ্বিতীয় পর্যায় ও দ্বিতীয় প্রকাশ।

(৩) তারপর মাতৃগর্ভে যখন প্রতিটি মানুষের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তিনটি চল্লিশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর এতে চেতনা পরিস্ফুটনের সময় আসে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার

নিয়োজিত ফেরেশ্‌তা তাঁরই হুকুম মোতাবেক ঐ শিশুর জন্য একটি ভাগ্যলিপি তৈরী করে দেয়। যার মধ্যে তার আয়ুষ্কাল, আমল, রিযিক এবং সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ থাকে। এ ভাগ্য লিখন হচ্ছে তকদীরের তৃতীয় পর্যায় এবং তৃতীয় প্রকাশ।

(৪) তারপর মানুষ যখন কোন কাজ করতে চায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশেই সে এটা করে। যেমন, ৭০ নং হাদীসে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, আর তিনি যেদিকে চান এগুলোকে সে দিকেই ঘুরিয়ে দেন। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে তকদীরের চতুর্থ স্তর এবং চতুর্থ পর্যায়ের প্রকাশ।

তকদীর সম্পর্কে এ আলোচনাটি মনে রাখলে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীসের মর্ম ও প্রয়োগস্থল বুঝতে ইনশাআল্লাহ্ কোন সমস্যা হবে না।

তকদীর সম্বন্ধে কয়েকটি সংশয়ের নিরসন

অনেক মানুষের মনে জ্ঞানের স্বল্পতা অথবা জ্ঞানশূন্যতার কারণে তকদীর সম্পর্কে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি হয়, সংক্ষেপে এগুলো সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা উপযোগী মনে করছি। এই প্রসঙ্গে নিম্নের তিনটি আপত্তি ও প্রশ্ন খুবই প্রসিদ্ধ।

(১) দুনিয়াতে ভাল-মন্দ যা কিছু হয়, এসবই যদি আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরের দ্বারাই হয় এবং তিনিই যদি সবকিছুই লিখে দিয়ে থাকেন, তাহলে সকল ভাল কাজের সাথে মন্দ কাজগুলোর দায়-দায়িত্বও আল্লাহ্ তা'আলার উপর বর্তাবে। (নাঊযুবিল্লাহ্)

(২) সবকিছু যখন পূর্বেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে এবং তাঁর ভাগ্যলিখন অখণ্ডনীয়, তাহলে বান্দা তো সে অনুসারে কাজ করতে বাধ্য। তাই তাদের কোন পুরস্কার ও শাস্তি না হওয়া চাই।

(৩) যা কিছু হবার তা যেহেতু পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে এবং এর বিপরীত কিছুই হতে পারে না, তাহলে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু করার প্রয়োজনই নাই। অতএব, দুনিয়া অথবা আখেরাতের কোন কাজের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা তো অহেতুক প্রয়াস।

কিন্তু একটু চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এই তিনটি সংশয়ই তকদীর সম্পর্কে ভুল এবং অসম্পূর্ণ ধারণার কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ভাগ্য নির্ধারণের কাজটি তাঁর অসীম ও অনন্ত জ্ঞানের আলোকে করা হয়েছে। এ জগতের বুকে যা কিছু যেভাবে এবং যে ধারায় সংঘটিত হচ্ছে এগুলো ঠিক এভাবে এবং এ ক্রমধারায় তাঁর অনন্ত জ্ঞানের মধ্যে উপস্থিত ছিল এবং সেভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা এসব নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই নিজের আমল ও কর্মের উপর চিন্তা করবে, সে নিঃসন্দেহে এ বাস্তব কথাটি উপলব্ধি করতে পারবে যে, আমরা ভাল-মন্দ যে কোন কাজই করি সেটা নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতায়ই করি। যে কোন কাজ করার সময় যদি আমরা চিন্তা করে দেখি, তাহলে স্পষ্টভাবে এবং নিশ্চিতভাবে এ কথা উপলব্ধি করতে পারব যে, কাজটি করার এবং না করার আমাদের এখতিয়ার ও ক্ষমতা রয়েছে। তারপর এ ক্ষমতা সত্ত্বেও আমরা আল্লাহ্প্রদত্ত ইচ্ছাশক্তি ও এখতিয়ার দ্বারা কাজটি করা অথবা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কাজটি সংঘটিত হয়ে থাকে। অতএব, এ জগতে যেভাবে আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও এখতিয়ার দ্বারা সকল কাজ করে থাকি, আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত জ্ঞানে এগুলো এভাবেই ছিল

এবং তিনি এভাবেই এগুলো নির্ধারণ করেছেন। (তাই বলা যায় যে, আমরা এগুলো করব বলেই তিনি লিখে রেখেছেন, তিনি লিখে রেখেছেন বলে আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি, একথা ঠিক নয়।)

যাহোক, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু আমাদের কর্মকাণ্ডই নির্ধারণ করেন নি; বরং যে ইচ্ছাশক্তি ও এখতিয়ার দ্বারা আমরা কাজ করি, সেটাও তকদীরের অন্তর্ভুক্ত। তকদীরে শুধু এটাই লিখা হয়নি যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ভাল অথবা মন্দ কাজটি করবে; বরং তকদীরে এ পূর্ণ কথাটি লিখা আছে যে, অমুক ব্যক্তি তার ইচ্ছা শক্তি ও এখতিয়ার দ্বারা এ কাজটি করবে, তারপর এর ফলাফল প্রকাশ পাবে এবং সে পুরস্কার অথবা শাস্তি পাবে।

সারকথা, আমাদের কর্ম সম্পাদনে যে এক ধরনের নিজস্ব এখতিয়ার ও নিজস্ব ইচ্ছা শক্তি রয়েছে– যার ভিত্তিতে আমরা কোন কাজ করার অথবা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, সেটাও তকদীরে লিখা আছে এবং আমাদের সকল কাজের দায়-দায়িত্ব সে ইচ্ছাশক্তির উপরই বর্তায়। আর এরই ভিত্তিতে মানুষ আল্লাহ্র আইন পালনে বাধ্য হয়ে থাকে এবং এর উপরই পুরস্কার অথবা শাস্তির ভিত রচিত হয়। বস্তুতঃ তকদীর মানুষের এই নিজস্ব এখতিয়ার ও নিজের ইচ্ছাশক্তিকে বাতিল ও নিঃশেষ করে দেয়নি; বরং এটাকে আরো সুদৃঢ় ও মজবুত করে দিয়েছে। তাই ভাগ্য লিখনের কারণে আমরা কোন কাজে বাধ্য অথবা অপারগ নই এবং কর্মের দায়-দায়িত্বও আল্লাহ্র উপর বর্তাবে না।

অনুরূপভাবে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ দুনিয়াতে আমরা যেসব চেষ্টা-তদ্বীর করে থাকি, এসব চেষ্টা-সাধনাও তকদীরের সাথে সম্পর্কিত। তাই তকদীরে শুধু এটাই লেখা হয়নি যে, অমুক ব্যক্তি অমুক জিনিসটি লাভ করবে; বরং যে চেষ্টা-তদ্বীরের দ্বারা দুনিয়াতে এ জিনিসটি লাভ করবে, সেটাও তকদীরের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে।

যাহোক, আগেই বলা হয়েছে যে, তকদীরের মধ্যে সকল উপকরণ এবং উপকরণ দ্বারা অর্জিত বস্তুসমূহের ধারা ঠিক সেরূপ, যেরূপ এ দুনিয়াতে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই এ ধারণা করা যে, তকদীরে যা আছে সেটা আপনা আপনিই হয়ে যাবে এবং এ ধারণায় দুনিয়াতে চেষ্টা-সাধনা থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আসলে তকদীরের স্বরূপ না বুঝারই প্রমাণ। হাদীস নং ৬৪ এবং ৬৫ তে কয়েকজন সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, এর মূল কথাও তাই।

সারকথা, যদি তকদীরের পূর্ণ স্বরূপকে সামনে রাখা হয়, তাহলে এ জাতীয় কোন প্রশ্ন এবং সংশয়ই সৃষ্টি হবে না।

✪✪✪

মরণোত্তর জীবন

বরযখ, কেয়ামত ও আখেরাত

কয়েকটি মৌলিক কথা

মৃত্যুপরবর্তীকালীন অবস্থা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পাঠ ও এর মর্ম উপলব্ধি করার আগে কয়েকটি মৌলিক বিষয় জেনে নেওয়া উচিত। এ বিষয়গুলো মনে উপস্থিত রাখার পর ঐসব হাদীসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন সংশয় সৃষ্টি হবে না, বাস্তবতা উপলব্ধি না করার কারণে বর্তমান যুগে অনেকের মনে যা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(১) নবী-রাসূলদের বিশেষ কাজ (অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে তাঁরা দুনিয়ায় প্রেরিত হয়ে থাকেন,) সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ঐসব বিষয় বলে দেওয়া, যা জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতি দ্বারা সেগুলো নিজেরা বুঝতে পারি না। অর্থাৎ, ঐ বিষয়গুলো আমাদের জ্ঞানোপলব্ধির ঊর্ধ্বে।

(২) নবী-রাসূলদের কাছে নিশ্চিত জ্ঞানলাভের একটি মাধ্যম রয়েছে, যা অন্যান্য সাধারণ মানুষের কাছে নেই। সেটা হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী পাওয়া। তাঁরা এর মাধ্যমে ঐসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে থাকেন, যেগুলো আমরা আমাদের চোখ, কান ও জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ব করতে পারি না। যেমন, দূরবীক্ষণ যন্ত্রধারী ব্যক্তি অনেক দূরের ঐসব বস্তু দেখতে পারে, যেগুলো অন্যান্য মানুষ খালি চোখে দেখতে পায় না।

(৩) নবীকে নবী বলে স্বীকার করে নেওয়ার এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার অর্থ এটাই হয় যে, আমরা এ কথা স্বীকার করে নিলাম এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে মেনে নিলাম যে, তিনি যেসব বিষয় বর্ণনা করেন, সেগুলো তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহী জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন এবং এসব বিষয়সমূহ অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এতে সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

(৪) নবী-রাসূলগণ কখনো এমন কোন কথা বলেন না, যা জ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতি (ঐশী জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে) সেটা বুঝতে অপারগ; বরং এমন হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, নবী-রাসূলগণ যদি কেবল সেসব বিষয়ই বর্ণনা করবেন, যেগুলো আমরা নিজেরাই চিন্তা-ভাবনা দ্বারা বুঝে নিতে পারি, তাহলে তাঁদেরকে প্রেরণ করার প্রয়োজনটাই বা কি?

(৫) নবী-রাসূলগণ মৃত্যু পরবর্তীকালীন অর্থাৎ বরযখের জগত এবং পরকালীন জগত সম্পর্কে যাকিছু বলেছেন, এর মধ্যে কোন একটি বিষয়ও এমন নেই, যা জ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব বিবেচিত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো চিন্তা-ভাবনা করে জেনে বা বুঝে নেয়া আমাদের নিজেদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ দুনিয়াতে এসব জিনিসের কোন দৃষ্টান্ত ও নমুনা না থাকার কারণে আমরা এগুলো এভাবে বুঝতে পারি না, যেভাবে দুনিয়ার দৃশ্য বস্তুসমূহের বেলায় বুঝে নিতে পারি।

(৬) সৃষ্টিগতভাবে আমাদেরকে জ্ঞানলাভের যেসব মাধ্যম দান করা হয়েছে, যেমন ঃ চোখ, কান, নাক এবং জ্ঞান-বুদ্ধি এগুলোর শক্তি ও কর্মের পরিধি খুবই সীমিত। আমরা দেখি যে, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং এগুলোর মাধ্যমে এমন অনেক জিনিস আমাদের জ্ঞানের আওতায় এসে যায়, পূর্বে যেগুলোর কল্পনাও করা হত না। যেমন ঃ পানি অথবা রক্তের মধ্যে যেসব রোগ-জীবানু থাকে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বর্তমানে মানুষের চোখ এগুলো দেখে নিতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কান হাজার হাজার মাইল দূরের আওয়াজ শুনে নেয়। অনুরূপভাবে পুস্তকজ্ঞানের মাধ্যমে একজন শিক্ষিত মানুষের মেধা ও জ্ঞান এর চেয়ে বেশী চিন্তা-গবেষণা করতে পারে, যা চোখ-কানের দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে সে করতে পারত। এ অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গেল যে, কোন বাস্তব জিনিসকে কেবল এ বলে অস্বীকার করা এবং তা প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া যে, যেহেতু আমরা বর্তমানে এটা দেখি না, শুনি না এবং আমাদের উপলব্ধিতে আসে না— তাই এটা আমরা মানব না— এ মনোবৃত্তি খুবই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "তোমাদেরকে কেবল সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"

(৭) মানুষ দু'টি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। প্রথমটি হচ্ছে দেহ, যা প্রকাশ্য ও চোখে দেখা যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আত্মা, যা চোখে দেখা না গেলেও এর অস্তিত্বকে আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। তারপর এ দু'টি জিনিসের পারস্পরিক সম্পর্ক দুনিয়াতে আমরা দেখে থাকি যে, কষ্ট ও মুসীবত অথবা শান্তি ও আনন্দের প্রতিক্রিয়া সরাসরি দেহের উপর হয় এবং আত্মা দেহের অনুগামী হয়ে এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যেমন ঃ মানুষ যখন কোন আঘাত পায় বা আহত হয় অথবা শরীরের কোন অঙ্গ আগুনে পুড়ে যায়, তখন আঘাত এবং আগুনের সম্পর্ক সরাসরি দেহের সাথে থাকে। কিন্তু এর প্রভাবে তার আত্মারও কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে পানাহার দ্বারা যে স্বাদ গ্রহণ করে সেটাও সরাসরি দেহেরই লাভ হয়; কিন্তু আত্মাও এতে তৃপ্তি ও আনন্দ পায়।

সারকথা, এই দুনিয়াতে মানুষের অস্তিত্বে এবং তার বিভিন্ন অবস্থায় যেন দেহই আসল এবং আত্মা তার অনুগামী। পক্ষান্তরে কুরআন, হাদীসে বরযখ তথা কবর জগত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, এতে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সেখানে অবস্থা এর বিপরীত হবে। অর্থাৎ, ঐ জগতে যার উপর ভাল-মন্দ যাকিছুই ঘটবে তা সরাসরি আত্মার উপর ঘটবে এবং দেহ এর অনুগামী হিসাবে প্রভাবান্বিত হবে। এ বাস্তবতাটি যাতে আমরা সহজে বুঝে নিতে পারি, এ জন্যই হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়াতে এর একটি নমুনা ও উদাহরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, আর সেটা হচ্ছে স্বপ্নজগত। জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী প্রত্যেক মানুষই এমন স্বপ্ন দেখে, যাতে সে অনেক আনন্দ পায় অথবা তার খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নের এ আনন্দ অথবা কষ্ট সরাসরি আত্মার সাথে সম্পর্কিত, আর দেহ অনুগামী হয়ে এর প্রভাব গ্রহণ করে থাকে মাত্র। অর্থাৎ, স্বপ্নে মানুষ যখন দেখে যে, সে কোন খাবার খাচ্ছে, তখন সে কেবল এটাই দেখে না যে, তার আত্মা অথবা কল্পনাশক্তি খাবার খাচ্ছে; বরং সে এটাই দেখে যে, জাগ্রত অবস্থার ন্যায় নিজের মুখ দিয়েই খাদ্যগ্রহণ করছে, যেভাবে দৈনিক সে খাবার গ্রহণ করে থাকে। অনুরূপভাবে সে স্বপ্নে যদি দেখে যে, কেউ তাকে প্রহার করছে, তাহলে সে এটা দেখে না যে, তার আত্মাকে প্রহার করা হচ্ছে; বরং সে এটাই দেখে যে, প্রহার তার গায়েই পড়েছে এবং তখন তার দেহে এ প্রহারের আঘাত এমনই লেগে থাকে, যেমন জাগ্রত অবস্থায় লেগে থাকে। অথচ বাস্তবে যা

ঘটছে সেটা আত্মার উপর ঘটছে, আর দেহ অনুগামী হিসাবে এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করছে। তবে কোন কোন সময় দেহের এ প্রতিক্রিয়া এতটুকু অনুভূত হয়ে থাকে যে, মানুষ জাগ্রত হওয়ার পরও এর চিহ্ন এবং প্রতিক্রিয়া দেখতে পায়।

সারকথা, ঘুমের অবস্থায় স্বপ্নদর্শনকারীর উপর ভাল অথবা মন্দ যা ঘটে, সেটা মূলতঃ সরাসরি আত্মার উপরই ঘটে, আর দেহ অনুগামী হিসেবে এর উপর এর প্রভাব পড়ে থাকে। এ জন্যই স্বপ্নদর্শনকারীর কাছে উপস্থিত মানুষটিও তার দেহে কোন কিছু সংঘটিত হতে দেখে না। কেননা, আমরা এ দুনিয়াতে কোন মানুষের কেবল ঐসব অবস্থাই দেখতে পারি, যার সম্পর্ক তার দেহের সাথে সম্পৃক্ত।

অতএব, বরযখ জগতে অর্থাৎ মরণের পর থেকে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত মানুষের উপর দিয়ে ভাল-মন্দ যা কিছু অতিক্রান্ত হবে, সেটা মূলতঃ এবং সরাসরি আত্মার উপর সংঘঠিত হবে এবং দেহ অনুগামী হিসাবে এর অংশীদার থাকবে। স্বপ্ন জগতের অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়টি বুঝে নেওয়া কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য খুব কঠিন ব্যাপার নয়।

আশা করি, এ জগত এবং কবর ও বরযখ জগতের এ পার্থক্যটি উপলব্ধি করে নেওয়ার পর কারো অন্তরে ঐসব সংশয় ও খটকা সৃষ্টি হবে না, যা কবরের সওয়াল-জওয়াব এবং শান্তি ও শাস্তি সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের ব্যাপারে কোন কোন সংশয়প্রবণ মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বরযখ তথা কবর জগত

(৭১) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا دِيْنُكَ ؟ فَيَقُوْلُ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ، فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ وَمَا يُدْرِيْكَ ؟ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ و صَدَّقْتُ، فَذَالِكَ قَوْلُهٗ "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الاية" قَالَ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهٗ، قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْتَحُ لَهٗ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهٖ ـــــ وَاَمَّا الكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهٗ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهٗ فِى جَسَدِهٖ وَيَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ،فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ، فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى النَّارِ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهٗ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهٗ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهٗ اَعْمٰى اَصَمُّ مَعَهٗ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ صَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهٗ بِهَا ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ * (رواه احمد وابوداؤد)

৭১। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ (আল্লাহ্‌র মু'মিন বান্দা যখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে বরযখ জগতে পৌঁছে, অর্থাৎ, তাকে কবরে দাফন করা হয়, তখন) তার কাছে দু'জন ফেরেশ্‌তা আসে এবং তাকে বসায়। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার রব কে ? সে উত্তর দেয়, আমার রব আল্লাহ্‌। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তোমার দ্বীন কি ? সে উত্তরে বলে, আমার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে, এই লোকটির ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, যাকে তোমাদের মধ্যে (নবী হিসাবে) প্রেরণ করা হয়েছিল ? সে উত্তর দেয়, তিনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল। ফেরেশ-তাদ্বয় তখন বলে, তুমি কিভাবে জানলে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলে ঃ আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি (আর এই কিতাবই আমাকে বলে দিয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল।) তাই আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছি। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ) মু'মিন বান্দার এ উত্তর প্রসঙ্গেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিনদেরকে দৃঢ়বাক্যের উপর দৃঢ়পদ রাখেন দুনিয়া এবং আখেরাতে। অর্থাৎ, তাদেরকে গোমরাহী থেকে এবং এর ফলে আগত আযাব থেকে নিরাপদে রাখা হয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (মু'মিন বান্দা যখন ফেরেশ্‌তাদের উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ঠিকমত দিয়ে দেয়,) তখন আসমান থেকে একজন ঘোষক এ ঘোষণা দেয়, (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়) যে, আমার বান্দা ঠিক কথাই বলেছে। তাই তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দাও। আল্লাহ্‌র নির্দেশমত তখন দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং এর ফলে জান্নাতের সুবাতাস ও সুরভি তার কাছে আসতে থাকে, আর কবরকে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়। (অর্থাৎ, সকল পর্দা এভাবে উঠিয়ে দেওয়া হয় যে, যে পর্যন্ত তার দৃষ্টি যায়, সে জান্নাতের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে থাকে।)

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরের মৃত্যুর আলোচনা করলেন এবং বললেন ঃ মৃত্যুর পর তার আত্মাকে দেহে সংযোজন করা হয় এবং তার নিকটও দুই ফেরেশতা এসে তাকে বসায়। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার রব কে ? সে বলে, হায় হায় আমি তো কিছুই জানি না। তারপর ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার ধর্ম কি ছিল ? সে বলে, হায় হায় আমি তো কিছুই জানি না। তারপর ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞাসা করে, যে লোকটি তোমাদের কাছে (নবী হিসাবে) প্রেরিত হয়েছিলেন, তার ব্যাপারে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে ? সে তখনও এ কথাই বলে, হায় হায় আমি তো কিছুই জানি না। (এই সওয়াল-জওয়াবের পর) আসমান থেকে একজন ঘোষক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয় যে, সে মিথ্যা বলেছে। (অর্থাৎ, ফেরেশ্‌তাদের প্রশ্নের উত্তরে সে যে নিজেকে অজ্ঞ ও সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে প্রকাশ করেছে, এটা সে মিথ্যা বলেছে। কেননা, বাস্তবে সে আল্লাহ্‌র তওহীদ, তাঁর ধর্ম ইসলাম এবং তাঁর সত্য নবীর অস্বীকারকারী ছিল।) অতএব, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দেয় যে, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাহান্নামের লেবাস পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। (তখন নির্দেশমত এসব কিছুই করা হয়।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

জাহান্নামের এ দরজা দিয়ে গরম বাতাস ও এর উত্তাপ তার কাছে আসতে থাকে। আর তার কবরকে তার জন্য এমন সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, এর চাপে তার শরীরের এক দিকের পাঁজরের হাড় অন্য দিকে ঢুকে যাবে। তারপর তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এমন এক ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, যে হবে অন্ধ ও বধির। তার কাছে লোহার এমন মুগুর থাকবে যে, এটা দিয়ে কোন পাহাড়ে আঘাত করলে সেটাও মাটির স্তুপ হয়ে যাবে। সেই ফেরেশ্‌তা এই মুগুর দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করবে, এর ফলে সে এমন চিৎকার করবে যে, তার এ চিৎকারের শব্দ মানুষ ও জ্বিন ছাড়া পূর্বে-পশ্চিমের সবকিছুই শুনতে পাবে। এ আঘাতে সে মাটি হয়ে যাবে এবং তারপর আবার এতে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। —মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ

(৭২) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهٗ اِنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَ انِهٖ فَيَقُوْلاَنِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ فَيُقَالُ لَهٗ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهٗ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِى هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهٗ مَا دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ * (رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى)

৭২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যুর পর যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং জানাযার সাথে আগত তার সাথীরা চলে যায়, (এবং তারা এত নিকটে থাকতেই যে,) মৃতব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময়ই তার কাছে দুই ফেরেশ্‌তা এসে তাকে বসায় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতে ? খাঁটি মু'মিন ব্যক্তি এর উত্তরে বলে যে, আমি (মৃত্যুর পূর্বেও সাক্ষ্য দিতাম এবং এখনও) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর সত্য নবী। এ উত্তর শুনে ফেরেশ্‌তাদ্বয় বলবে, (ঈমান না আনলে) জাহান্নামে তোমার যে জায়গা হবার ছিল, তা একটু দেখে নাও। এখন আল্লাহ্ এর পরিবর্তে তোমাকে জান্নাতে যে ঠিকানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটাও দেখে নাও। (অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নামের উভয় ঠিকানাই তার সামনে তুলে ধরা হবে।) ফলে উভয় ঠিকানাই সে এক সাথে দেখে নেবে।

অপরদিকে মুনাফেক ও কাফেরকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে (এবং তাঁকে কী এবং কেমন মনে করতে ?) এ প্রশ্নের উত্তরে ঐ মুনাফেক ও কাফের বলবে, আমি নিজে তো তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না। অন্য লোকেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। তার এ উত্তর দেওয়ার পর তাকে বলা হবে যে, তুমি নিজেও জানতে চেষ্টা করনি এবং যারা জানত তাদের

অনুসরণও করনি। তারপর তাকে লোহার মুগুর দিয়ে আঘাত করা হবে। ফলে সে এমন চিৎকার করবে যে, জ্বিন ও মানুষ ছাড়া তার আশেপাশের সবকিছুই তার চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পাবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম হাদীসটি দ্বারা বুঝা গিয়েছিল যে, মৃত ব্যক্তির নিকট ফেরেশ্‌তারা তিনটি প্রশ্ন করে, আর এ দ্বিতীয় হাদীসে কেবল একটি প্রশ্নের উল্লেখ দেখা যায়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, এ প্রশ্নটি যেহেতু অন্য দু'টি প্রশ্নকেও নিজের মধ্যে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং এর উত্তর দ্বারা ঐ দু'টি প্রশ্নেরও উত্তর হয়ে যায়, তাই কোন কোন হাদীসে কেবল এ প্রশ্নটির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। (যেমনটি এ হাদীসে করা হয়েছে।) কুরআন হাদীসের বর্ণনাভঙ্গী এটাই যে, কোন বিষয়কে কখনো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়, আর কখনো কেবল এর অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ দ্বিতীয় হাদীসটিতে সওয়াল-জওয়াব প্রসঙ্গে কবর শব্দটিও এসেছে। অনুরূপভাবে অন্য কিছু হাদীসেও 'কবর' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর দ্বারা একথা বুঝা উচিত হবে না যে, এ সওয়াল-জওয়াব কেবল ঐসব মুর্দাদেরকে করা হবে, যাদেরকে কবরে দাফন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে কবরের উল্লেখ কেবল এ কারণে করা হয়েছে যে, সেখানে মুর্দাদেরকে কবরেই দাফন করার সাধারণ প্রচলন ছিল এবং লোকেরা কেবল এ পদ্ধতির সাথেই পরিচিত ছিল। অন্যথায় এ সওয়াল-জওয়াব প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকেই করা হয়, চাই তার দেহ কবরে দাফন করা হোক, চাই নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হোক, চাই আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হোক অথবা কোন মাংসভোজী প্রাণীর উদরে চলে যাক। আগেই বলা হয়েছে যে, এসব কিছুই সরাসরি এবং প্রকৃতপক্ষে আত্মার উপর সংঘটিত হয় আর দেহ যেখানেই এবং যে অবস্থায়ই থাকুক, সেটা কেবল আত্মার অনুগামী হয়ে এসব প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে থাকে। স্বপ্নের দৃষ্টান্তই এই বিষয়টি বুঝার জন্য যথেষ্ট।

আর স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দ্বারাই এ সন্দেহের উত্তর হয়ে যায় যে, কোন কোন সময় এমনও তো হয় যে, কোন মুর্দা দু' চার দিন পর্যন্ত আমাদের সামনে পড়ে থাকে, কিন্তু এ সওয়াল-জওয়াবের শব্দ তার লাশ থেকে কেউ শুনতে পায় না এবং তার উপর কোন আযাব ও শাস্তির লক্ষণও দেখা যায় না। বস্তুতঃ এ বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন স্বপ্নে একজনের উপর অনেক কিছুই ঘটে যায়, যেমন সে কথা বলে, খায় ও পান করে; কিন্তু তার পাশের লোকেরা এর কিছুই দেখতে পায় না।

এই ধরনের আরেকটি অজ্ঞতাপ্রসুত ও মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন কবরের সওয়াল-জওয়াব সম্পর্কে এ করা হয় যে, কবরে যাওয়ার জন্য যখন কোন রাস্তা এবং কোন ছিদ্রও থাকে না; তাহলে ফেরেশ্‌তা সেখানে যায় কি করে ? এ সন্দেহটি প্রকৃতপক্ষে ঐসব অজ্ঞদের হয়ে থাকে, যারা ফেরেশ্‌তাদেরকে নিজেদের মত চর্ম-মাংসের তৈরী জড়পদার্থের সৃষ্টি মনে করে। আসল বিষয় হচ্ছে এই যে, ফেরেশ্‌তাদের কোথাও পৌঁছার জন্য কোন দরজা-জানালার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দৃষ্টি অথবা সূর্যের কিরণ যেভাবে কাঁচের ভিতর দিয়ে বের হয়ে যায়, তদ্রূপভাবে ফেরেশ্‌তারা তাদের অস্তিত্বের সূক্ষ্মতা এবং আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তি দ্বারা পাথরের ভিতর দিয়েও পার হয়ে যেতে পারে। সুবহানাল্লাহ!

(٧٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ * (رواه البخارى ومسلم)

৭৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, তখন প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে নিজ ঠিকানা পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতী হয়ে থাকে, তাহলে জান্নাতীদের মধ্যে (তার যে স্থান হবে, সেটা প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় তাকে দেখানো হয়।) আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাহলে জাহান্নামীদের মধ্যে (তার যে ঠিকানা নির্ধারিত সেটা দেখানো হয়।) তাকে বলা হয় যে, এটা হচ্ছে তোমার স্থায়ী ঠিকানা, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর দিকে উঠিয়ে নিবেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কবরে দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীরা তাদের স্থায়ী আবাস দেখে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করবে এবং জাহান্নামীরা তাদের জাহান্নামের ঠিকানা দেখে সকাল-সন্ধ্যায় যে দুঃখ ও কষ্ট পাবে, এই দুনিয়াতে কেউই এর অনুমানও করতে পারবে না। (আনন্দ ও দুঃখ দেয়ার জন্যই তাদেরকে পূর্ব থেকে আপন আপন ঠিকানা দেখানো হতে থাকবে।)

আল্লাহ্ তা'আলা আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

(٧٤) عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهٗ فَقِيْلَ لَهٗ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلاَ تَبْكِىْ وَتَبْكِىْ مِنْ هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهٗ اَيْسَرُ مِنْهُ وَ اِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهٗ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ * (رواه الترمذى وابن ماجة)

৭৪। হযরত ওছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, (তাঁর অবস্থা ছিল এই যে,) তিনি যখন কোন কবরের কাছে দাঁড়াতেন, তখন খুব কাঁদতেন। এমনকি চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে এত কাঁদেন না, অথচ কবরের কারণে এত কান্নাকাটি করেন, এর কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবর হচ্ছে আখেরাতের মন্‌যিলসমূহের মধ্যে প্রথম মন্‌যিল। তাই কোন বান্দা যদি এখান থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে পরবর্তী মন্‌যিলগুলো তার জন্য খুবই সহজ হবে। আর যদি এখান থেকে সে মুক্তি না পায়, তাহলে পরবর্তী মন্‌যিলগুলো তার জন্য এর চেয়েও কঠিন হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন ঃ আমি কবরের দৃশ্যের চেয়ে অধিক ভয়াবহ কোন দৃশ্য আর দেখিনি। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ওছমান (রাঃ)-এর কথার মর্ম এই যে, আমি যখন কোন কবরের পাশ দিয়ে যাই, তখন কবর সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাগুলো স্মরণ হয়ে যায় এবং এ চিন্তা ও আশংকায় আমি কাঁদি।

(٧٥) عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْاَلُ * (رواه ابوداؤد)

৭৫। হযরত ওছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য শেষ করতেন, তখন তিনি কবরের পাশে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের এই ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ়তার জন্যও দো'আ কর। কেননা, এখনই সে ফেরেশ্তাদের প্রশ্নের মুখে পড়বে। —আবূ দাউদ

(٧٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ فَلَمَّا صَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُضِعَ فِيْ قَبْرِهٖ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ فَقَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ عَنْهُ * (رواه احمد)

৭৬। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মা'আয (রাঃ) যখন এন্তেকাল করলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণ করার জন্য বের হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন এবং তাঁকে কবরে রেখে মাটি সমান করে দেওয়া হল, তখন তিনি কয়েকবার সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্ বললেন। আমরাও দীর্ঘক্ষণ সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্ বললাম। তারপর তিনি আল্লাহু আকবার বললেন এবং আমরাও আল্লাহু আকবার বললাম। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কেন সুবহানাল্লাহ পড়লেন এবং এরপর আবার আল্লাহু আকবার পড়লেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্র এই নেক বান্দার কবর খুবই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। (যে কারণে তার কষ্ট হচ্ছিল।) এখন আল্লাহ্ তা'আলা তার কবরের এ সংকীর্ণতা দূর করে দিয়ে প্রশস্ততা দান করেছেন এবং তার কষ্টও দূর করে দিয়েছেন। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ এই সা'দ ইবনে মা'আয আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণের মর্যাদা ও সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছিলেন। হিজরী ৫ম সনে তাঁর এন্তেকাল হয়। অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাঁর জানাযায় ৭০ হাজার ফেরেশ্তা অংশ গ্রহণ করেছিল এবং আকাশের দরজাসমূহ তাঁর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও কবরের সংকীর্ণতার কষ্ট তাঁকেও পেয়েছিল। (যদিও সাথে সাথেই এ কষ্ট দূর করে দেওয়া হয়েছিল।) এই ঘটনায় আমাদের জন্য বড়ই সতর্কতাসংকেত এবং বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর দয়া কর, তুমি আমাদেরকে রক্ষা কর।

(৭৭) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَالِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً * (رواه البخارى)

৭৭। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। এতে তিনি ঐ ভীষণ পরীক্ষার কথা উল্লেখ করলেন, মৃত ব্যক্তি কবরে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তিনি যখন এ বিষয়টির আলোচনা করলেন, তখন মুসলমানদের মধ্যে চিৎকার ও কান্নার রোল পড়ে গেল। —বুখারী

(৭৮) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَائِطٍ لِبَنِى النَّجَّارِ عَلٰى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ اِذْ حَادَتْ بِهٖ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَ اِذَا اَقْبُرٌ سِتَّةٌ اَوْ خَمْسَةٌ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ اَصْحَابَ هٰذِهِ الْاَقْبُرِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ فَمَتٰى مَاتُوْا قَالَ فِى الشِّرْكِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلٰى فِىْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا اَنْ لَا تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ اَنْ يُّسْمِعَكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِىْ اَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ *

(رواه مسلم)

৭৮। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে বনূ নাজ্জারের একটি বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে তাঁর খচ্চরটি রাস্তা থেকে সরে গেল এবং বেঁকে বসল। তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পিঠ থেকে ফেলে দেবে। এরই মধ্যে দেখা গেল যে, এখানে ছয়টি অথবা পাঁচটি কবর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই কবরের অধিবাসীদেরকে কে চেনে? এক ব্যক্তি বলল, আমি চিনি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এরা কবে মারা গিয়েছে? সে উত্তর দিল, শিরকের যুগে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরা নিজেদের কবরে আযাবের সম্মুখীন হয়ে আছে। আমার যদি এই আশংকা না হত যে, তোমরা মুর্দাদেরকে দাফনই করবে না, তাহলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করতাম, যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আযাবের অবস্থা কিছুটা শুনিয়ে দেন, যা আমি শুনতে পাচ্ছি। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। সবাই বলল, আমরা জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র

নিকট আশ্রয় চাও। সবাই বলল, আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। আবার তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফেতনা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর ঃ সবাই বলল, আমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফেতনা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। এবার তিনি বললেন ঃ দাজ্জালের মহা ফেতনা থেকে তোমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। সবাই বলল, আমরা দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার অন্য কিছু হাদীস দ্বারা আগেই জানা গিয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বরযখ তথা কবর জগতের শাস্তিকে মানুষ ও জ্বিনজাতি থেকে গোপন রেখেছেন। তাই তারা এটা মোটেই অনুভব করতে পারে না। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টিকুল এটা কিছুটা অনুভব করতে পারে।

এ হাদীস দ্বারাও জানা গেল যে, বনূ নাজ্জারের ঐ বাগানে দাফনকৃত কিছু লোকের উপর কবরের যে আযাব হচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও সাথীরা এটা অনুভব না করতে পারলেও যে খচ্চরের উপর তিনি সওয়ার ছিলেন, সে এটা অনুভব করে নিয়েছিল এবং এর একটা প্রভাবও তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এর রহস্যও স্পষ্ট যে, মৃত ব্যক্তিদের উপর মৃত্যুর পর যা সংঘটিত হয়, এটা যদি আমরা সবাই দেখে নেই এবং শুনে নেই, তাহলে আর 'গায়েবের উপর ঈমান' থাকল না। আর এমন হলে দুনিয়ার এ ব্যবস্থাপনাও চলতে পারত না। কেননা, যে সময় আমাদের সামনে আমাদের কোন প্রিয়জন মারাত্মক কোন কষ্ট ও বিপদে পড়ে থাকে, তখন আমাদের দ্বারা কোন কাজই হতে পারে না। তাই কখনো যদি কবরের আযাব আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে অন্য কাজ করা তো দূরের কথা মায়েরা তাদের শিশুদেরকে দুধ পর্যন্ত পান করাতে পারবে না।

হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, ঐ কবরবাসীর উপর যে আযাব হচ্ছিল এবং যার ফলে কবরে চিৎকারের রোল পড়ে গিয়েছিল, এটা সাহাবায়ে কেরাম না শুনলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিকই শুনে যাচ্ছিলেন।

এ ব্যাপারটি ঠিক তেমনই ছিল, যেমন ওহী বহনকারী ফেরেশ্‌তা যখন ওহী নিয়ে আসত, তখন অনেক সময় সাহাবায়ে কেরামও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই থাকতেন, কিন্তু আগমনকারী ফেরেশ্‌তাকে তাঁরা দেখতে পেতেন না এবং তার আওয়াজ শুনতেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতেন এবং তার আওয়াজও শুনতেন। অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী লোকেরা তো এই অবস্থাটি খুব সহজেই বুঝে নিতে পারে। আমাদের মত সাধারণ লোকেরাও এটা স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দ্বারা কিছুটা বুঝে নিতে পারে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, 'যদি এ আশংকা না হত যে, তোমরা মৃতদেরকে দাফনই করবে না, তাহলে আমি দো'আ করতাম, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে কবরের আযাবের কিছুটা অবস্থা শুনিয়ে দেন, যা আমি শুনতে পাই।" এর মর্ম এই যে, কবরের আযাবের যে অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ শাস্তি ভোগকারী লোকদের চিৎকার ও রোদন যা আমি শুনতে পাচ্ছি, যদি আল্লাহ্ তা'আলা সেটা তোমাদেরকেও শুনিয়ে দেন, তাহলে এই আশংকা আছে যে, মৃত্যুর

প্রতি তোমাদের মনে এমন ভয় সৃষ্টি হবে যে, তোমরা মৃতদের দাফন কাফনের ব্যবস্থাও করতে পারবে না। এ জন্যই আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ দো'আ করি না।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে 'আশ্রয় প্রার্থনা'র প্রতি মনোযোগী হতে নির্দেশ দিলেন। এখানে এ শিক্ষা রয়েছে যে, মু'মিনদের উচিত কবরের আযাব দেখা এবং এটা শোনার চিন্তা না করে তারা যেন এ থেকে বাঁচার চিন্তা করে। এ আযাব এবং অন্য সকল আযাব ও ফেতনা থেকে বাঁচানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তাই সর্বদা তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যাবে। জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাইবে, কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাইবে, দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল ফেতনা থেকে আশ্রয় চাইবে। বিশেষ করে দাজ্জালের মহা ফেতনা থেকে আশ্রয় চাইতে থাকবে এবং কুফর ও শিরক এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা করবে, যেগুলো আল্লাহ্র আযাব ডেকে আনে।

কেয়ামত

(٧٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ * (رواه البخارى ومسلم)

৭৯। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এবং কেয়ামত এ দু'টি আঙ্গুলের মত। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শাহাদত আঙ্গুলী ও মধ্যমা অঙ্গুলীকে মিলিয়ে বললেন ঃ আমার পয়গম্বরী লাভ এবং কেয়ামতের মধ্যে এতটুকু নিকটসম্পর্ক ও সংযুক্তি রয়েছে, যতটুকু এ দুই আঙ্গুলের মাঝখানে। এর দ্বারা সম্ভবতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়াতে যতগুলো যুগ নির্ধারণ করেছিলেন এর সবগুলোই শেষ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এযুগ দুনিয়ার শেষ যুগ, যা আমার নবুয়াত লাভের কাল থেকে শুরু হয়েছে এবং কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে শেষ হবে। আমার এবং কেয়ামতের মাঝে কোন নতুন নবীও আসবে না এবং কোন নতুন উম্মতও সৃষ্টি হবে না। তাই কেয়ামতকে খুব দূরের জিনিস মনে করে তা থেকে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে বসে থাকা উচিত নয়।

(٨٠) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هٰذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ اَوَّلِهِ اِلٰى اٰخِرِهِ فَبَقِىَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِىْ اٰخِرِهِ فَيُوْشَكُ ذَالِكَ الْخَيْطُ اَنْ يَّنْقَطِعَ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৮০। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই দুনিয়ার উদাহরণ হচ্ছে ঐ কাপড়টির মত, যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং শেষ প্রান্তে কেবল একটি সূতার সংযোগ রয়েছে। আর এ সূতাটিও অচিরেই ছিঁড়ে যাবে। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম হাদীসটির মত এ হাদীসেও কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টিই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এটাই যে, কেয়ামতকে খুব দূরবর্তী মনে করে উদাসীন হয়ে থাকা যাবে

না; বরং এটাকে খুবই নিকটবর্তী এবং আকস্মিকভাবে আগত এক বিরাট ঘটনা মনে করে সর্বদা এর চিন্তা ও এর প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকা চাই।

(٨١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُوْنِّىْ عَنِ السَّاعَةِ وَ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ يَاْتِىْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِىَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ * (رواه مسلم)

৮১। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর এন্তেকালের এক মাস পূর্বে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আমার কাছে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে থাক, অথচ এর (নির্ধারিত সময়ের) জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই রয়েছে। তবে আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, বর্তমানে পৃথিবীর বুকে এমন কোন নিঃশ্বাস গ্রহণকারী মানুষ নেই, যার উপর দিয়ে একশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে এবং সে সময় পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআন দ্বারাও জানা যায় এবং হাদীস দ্বারাও যে, অনেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত যে, সেটা কবে আসবে ? তিনি এর উত্তরে সবসময় ঐ কথাই বলতেন, যা এ হাদীসে বলেছেন। অর্থাৎ, কেয়ামতের নির্ধারিত সময়কাল তিনিই জানেন যে, কোন্ সনের কোন্ মাসের কোন্ তারিখে তা সংঘটিত হবে। এর জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে নেই।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তর ছাড়া এবং মূল প্রশ্নের বাইরে অতিরিক্ত আরেকটি কথা এ বলে দিলেন যে, তৎকালীন পৃথিবীর বুকে যেসব মানুষ জীবিত ছিলেন, তারা সবাই শতাব্দীর মাথায় শেষ হয়ে যাবে। কথাটির মর্ম হচ্ছে, বড় কেয়ামত (যখন এই সারা বিশ্বজগত খতম হয়ে যাবে,) এর নির্দিষ্ট সময়কাল তো আমার জানা নেই। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই বিষয়টি অবহিত করে দিয়েছেন যে, এ প্রজন্ম এবং এ যুগের সমাপ্তি একশ বছরের মধ্যে হয়ে যাবে এবং বর্তমানে যারা জীবিত রয়েছে, তারা একশ বছর পূর্ণ হওয়ার ভিতরেই শেষ হয়ে যাবে। তাই এমন মনে করে নিতে পার যে, তোমাদের কেয়ামত (মৃত্যু) এ শতাব্দীর ভিতরেই এসে যাবে।

(٨٢) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى اَحَدٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ * (رواه مسلم)

৮২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামত আসবে না, যে পর্যন্ত (এমন দুঃসময় না এসে যায় যে,) পৃথিবীতে আল্লাহ্, আল্লাহ্, বলা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ এমন কোন ব্যক্তির উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যে বলে, আল্লাহ্, আল্লাহ্। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, কেয়ামত তখনই আসবে, যখন এ পৃথিবী আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং আল্লাহ্র স্মরণকারীদের থেকে সম্পূর্ণ খালি হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র এবাদত ও

আনুগত্য এবং আল্লাহ্র বন্দেগীর সঠিক সম্পর্ক দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবে। যখন এমন সময় আসবে, তখন এ সম্পূর্ণ জগত ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তাই মনে করতে হবে যে, আল্লাহ্র স্মরণ এবং আল্লাহ্র সাথে বান্দাসুলভ সঠিক সম্পর্কই যেন এ জগতের প্রাণ এবং এর অস্তিত্বের রক্ষাকবচ। তাই যে দিন আমাদের এ পৃথিবী এ জিনিস থেকে সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে যাবে, সেদিনই এর সৃষ্টিকর্তা এবং এর পরিচালনাকারী মহান আল্লাহ্র হুকুমে এটা ভেঙেচুরে মিসমার করে দেওয়া হবে।

(٨٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلٰى شِرَارِ الْخَلْقِ * (رواه مسلم)

৮৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামত কেবল মন্দ লোকদের উপরই সংঘটিত হবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী মু'মিন বান্দা যখন সবাই শেষ হয়ে যাবে এবং এ পৃথিবী যখন কেবল পাপাচারী ও আল্লাহ্বিমুখ মানুষের পৃথিবী হয়ে থাকবে, তখনই আল্লাহ্র নির্দেশে কেয়ামত এসে যাবে।

(٨٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ لَا اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ عَامًا فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَاَنَّهٗ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلُبُهٗ ثُمَّ يَمْكُثُ فِى النَّاسِ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنَ الشَّامِ فَلَا يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ اَوْ اِيْمَانٍ اِلَّا قَبَضَتْهُ حَتّٰى لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ دَخَلَ فِىْ كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَقْبِضَهٗ قَالَ فَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ فِىْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَاَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ اَلَا تَسْتَحْيُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ فَمَا تَاْمُرُنَا فَيَاْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَهُمْ فِىْ ذَالِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَلَا يَسْمَعُهٗ اَحَدٌ اِلَّا اَصْغٰى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا قَالَ وَ اَوَّلُ مَنْ يَّسْمَعُهٗ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ اِبِلِهٖ فَيَصْعَقُ وَ يَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا كَاَنَّهُ الطَّلُّ فَيَنْبُتُ مِنْهُ اَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ فَيُقَالُ اَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَّ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ، قَالَ فَذَالِكَ يَوْمٌ يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا وَذَالِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ * (رواه مسلم)

৮৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের পূর্বে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত দুনিয়াতে অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর বলেন, আমি বলতে পারছি না যে, এখানে চল্লিশ দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য কি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা ইবনে মরিয়মকে এ পৃথিবীতে পাঠাবেন। তাঁকে দেখে মনে হবে যে, তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদ। (অর্থাৎ, তাঁর চেহারা ও আকৃতির খুব মিল থাকবে উরওয়া ইবনে মাসউদের সাথে।) তিনি এসে দাজ্জালকে তালাশ করবেন (এবং তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে পেয়ে যাবেন এবং শেষ করে দেবেন।) তারপর তিনি মানুষের সাথে সাত বছর কাটাবেন। (তাঁর বরকতে মানুষের মধ্যে এমন সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে যে,) দু'টি মানুষের মধ্যে কোন শত্রুতা থাকবে না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ার দিক থেকে এক বিশেষ ধরনের ঠাণ্ডা বাতাস পাঠাবেন। ফলে পৃথিবীর বুকে এমন কোন ব্যক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না, যার অন্তরে অণু পরিমাণ পুন্য থাকবে অথবা বলেছেন, অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে। (ঐ ঠাণ্ডা বাতাসের প্রভাবে ঈমানদার ও ভাল মানুষগুলো শেষ হয়ে যাবে।) এমনকি তোমাদের কেউ যদি কোন পাহাড়ের ভিতরও থাকে, তাহলে এ বাতাস সেখানে গিয়েও তাকে শেষ করে দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর পর কেবল মন্দ লোকরাই দুনিয়াতে থেকে যাবে, (যাদের অন্তর ঈমান ও সৎকর্ম থেকে শূন্য থাকবে।) তাদের মধ্যে পাখীদের মত ক্ষিপ্রতা ও চাঞ্চল্য এবং হিংস্র প্রাণীদের স্বভাব দেখা যাবে। (বাহ্যতঃ এ কথাটির মর্ম হচ্ছে, তাদের মধ্যে জুলুম ও রক্তারক্তি তো থাকবে হিংস্র প্রাণীদের মত, আর তারা অন্যায় অভিলাষ পুরণে হবে হাল্কা-পাতলা ও বিদ্যুৎ গতির পাখীর মত দ্রুতগামী ও চঞ্চল।) পুণ্য ও কল্যাণের সাথে তারা পরিচিত হবে না এবং মন্দকে মন্দও মনে করবে না। এমন অবস্থায় শয়তান তাদের কাছে একটি আকৃতি ধরে আসবে এবং বলবে, তোমাদের কি লজ্জা হয় না ? তারা বলবে, তুমি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিতে চাও ? (অর্থাৎ, তুমি যা বলবে আমরা তাই করব।) শয়তান তখন তাদেরকে প্রতিমাপূজার নির্দেশ দেবে (এবং তারা তাই করতে শুরু করবে।) তারা তখন রিযিকের প্রাচুর্যে থাকবে এবং তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় মনে হবে। তারপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। এ ফুৎকারের শব্দ যার কানেই পৌঁছবে তার ঘাড়ের একটি দিক এক দিকে নেমে পড়বে আর অপর দিক উপরে উঠে থাকবে। (অর্থাৎ, মাথা দেহের উপর সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না; বরং কাত হয়ে যাবে।) সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ফুৎকারের শব্দ শুনবে, সে হবে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের উটের (পানি পান করার) হাউজ মাটি দিয়ে লেপতে থাকবে। সে এ শব্দ শুনে বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে। তারপর সকল মানুষ এভাবে বেহুশ হয়ে মরে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শিশিরের মত হাল্কা বৃষ্টি পাঠাবেন। এর ফলে মানুষের দেহ নতুনভাবে গজাবে। তৎপর দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং সবাই একসাথে দাঁড়িয়ে যাবে এবং চোখ মেলে দেখতে থাকবে। তারপর বলা হবে, হে লোকসকল! তোমাদের প্রতিপালকের দিকে চল। (আর ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) তাদেরকে হিসাবের ময়দানে সমবেত কর। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে। তারপর নির্দেশ জারী হবে যে, তাদের মধ্য থেকে জাহান্নামের হিস্যা বের কর। জিজ্ঞাসা করা হবে, কত সংখ্যার মধ্যে কত ? উত্তর দেওয়া হবে, প্রতি হাজারে নয় শ

নিরানব্বই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হবে ঐ দিন, যা শিশুদেরকে বুড়ো বানিয়ে দেবে এবং এটাই হবে ভীষণ মুসীবত ও চরম কষ্টের দিন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের আবির্ভাব থেকে নিয়ে হাশর পর্যন্ত; বরং হাশরের ময়দানের হিসাবে সমবেত হওয়া পর্যন্ত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের আরো অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কেয়ামতের পূর্বে সংঘটিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং কেয়ামতের পরবর্তী অধ্যায়সমূহের বর্ণনা এর চেয়েও সংক্ষেপে অথবা এর চাইতে কিছুটা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এসব হাদীস সম্পর্কে একথাটি মনে রাখতে হবে যে, হাজার হাজার বছরের এ দীর্ঘ সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলীর বর্ণনা এখানে খুবই সংক্ষেপে করা হয়েছে। যারা এ সূক্ষ্ম কথাটির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তারা ইনশাআল্লাহ্ এ হাদীসগুলোর মর্ম সহজে বুঝতে সক্ষম হবে।

হাদীসের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিন ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে, এক হাজারের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামে যাবে। পৃথিবীতে মুসলমান ও অমুসলমানদের সংখ্যানুপাতিক যে হার লক্ষ্য করা যায় এবং যা অধিকাংশ যুগেই ছিল, সেটা সামনে রাখলে হাজারে নয়শত নিরানব্বই এ সংখ্যাটি অসম্ভব মনে হয় না, তদুপরি হাদীসের অনেক ব্যাখ্যাকার লিখেছেন যে, এ হাজারে নয়শত নিরানব্বই-এর মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যা এমন লোকদেরও হবে, যারা পাপাচারের কারণে যদিও জাহান্নামের যোগ্য হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমার দ্বারা অথবা সুপারিশকারীদের সুপারিশ দ্বারা শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

(٨٥) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدْ الْتَقَمَهٗ وَ اَصْغٰى سَمْعَهٗ وَحَنٰى جَبْهَتَهٗ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ * (رواه الترمذى)

৮৫। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কিভাবে আনন্দ-ফূর্তি করতে পারি, অথচ শিঙ্গায় ফুৎকারকারী ফেরেশ্তা শিঙ্গা নিজের মুখে লাগিয়ে রেখেছে। সে নিজের কান পেতে এবং কপাল নীচু করে অপেক্ষা করছে যে, কখন শিঙ্গায় ফুৎকারের নির্দেশ দেওয়া হয়। (অর্থাৎ, এই বাস্তব বিষয়টি যেহেতু আমি জানি, তাই আমি কিভাবে এ দুনিয়াতে নিশ্চিন্ত মনে এবং আনন্দ-ফূর্তিতে থাকতে পারি ?) সাহাবাগণ আরয করলেন, তাহলে আমাদের প্রতি আপনার কি নির্দেশ ? (অর্থাৎ, ব্যাপারটি যেহেতু এমন ভয়াবহ, তাই আপনি আমাদের পথনির্দেশ করুন যে, কেয়ামতের এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য আমরা কি করব ?) তিনি উত্তর দিলেন ঃ তোমরা বল, হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি'মাল ওয়াকীল। —তিরমিযী

(٨٦) عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُعِيْدُ اللّٰهُ الْخَلْقَ وَمَا اٰيَةُ ذَالِكَ فِىْ خَلْقِهٖ قَالَ اَمَا مَرَرْتَ بِوَادِىْ قَوْمِكَ جَدْبًا ثُمَّ مَرَرْتَ بِهٖ يَهْتَزُّ خَضِرًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتِلْكَ اٰيَةُ اللّٰهِ فِىْ خَلْقِهٖ كَذَالِكَ يُحْيِى اللّٰهُ الْمَوْتٰى * (رواه رزين)

৮৬। আবূ রযীন উকাইলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলকে (মৃত্যুর পর) পুনরায় কিভাবে সৃষ্টি করবেন এবং এই জগতে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এর কী কোন নিদর্শন রয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের এমন কোন প্রান্তর দিয়ে যাওনি, যা এক সময় অনাবৃষ্টির কারণে শষ্য ও তৃণলতাশূন্য এবং শুকনো ছিল। তারপর সেখান দিয়ে কি তুমি এমন অবস্থায় পথ অতিক্রম করনি যে, (বৃষ্টিপাতের দ্বারা) তা সবুজ-শ্যামল হয়ে গিয়েছে। আবূ রযীন বলেন, আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, (এমন হয়েছে এবং উভয় দৃশ্যই আমি দেখেছি।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ (মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভের জন্য) এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে তাঁর নিদর্শন, এভাবেই তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন। —রযীন

(٨٧) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهٗ رَاْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَءْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ * (رواه احمد والترمذى)

৮৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার কাছে এটা ভাল লাগে যে, সে কেয়ামতের দৃশ্য চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করবে, সে যেন কুরআন পাকের সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক পড়ে। —আহমাদ, তিরমিযী

(٨٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهٖ اَخْبَارُهَا * (رواه احمد والترمذى)

৮৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা যিলযালের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার মর্ম হচ্ছে, কেয়ামতের দিন ভূমি নিজের সকল বৃত্তান্ত বলে দেবে। তারপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বলতে পার, ভূমির বৃত্তান্ত কি ? তাঁরা নিবেদন করলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ তার বৃত্তান্ত বর্ণনার অর্থ হচ্ছে, সে প্রত্যেক বান্দা-বান্দীর বেলায় এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, সে অমুক দিন আমার বুকের উপর এই কাজ করেছিল। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে ভূমির বৃত্তান্ত বর্ণনা, যা কেয়ামতের দিন সে করবে। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ পৃথিবীর যে অংশে যে কাজই করে, পৃথিবীর এ ভূমি সেটা সংরক্ষণ করে রাখে এবং কেয়ামত পর্যন্তই সংরক্ষণ করে রাখবে এবং সেদিন আল্লাহ্র সামনে এর সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ঐ দিনের অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করুন।

এ ধরনের বিষয়সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মু'মিনদের জন্য তো পুর্বেও কোন কঠিন বিষয় ছিল না। আর বর্তমানে তো নতুন নতুন অনেক আবিষ্কার এইসব বিষয়কে বুঝা এবং এগুলোর উপর ঈমান আনা সবার জন্যই সহজ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমি তাদেরকে আমার নিদর্শণাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং স্বয়ং তাদের মধ্যে।

(٨٩) عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَدْنِي الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرْقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِلٰى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرْقُ اِلْجَامًا وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ اِلٰى فِيْهِ * (رواه مسلم)

৮৯। হযরত মেকদাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কেয়ামতের দিন সূর্য মানুষের এত নিকটবর্তী হবে যে, এটা তাদের থেকে মাত্র এক মাইলের দূরত্বে থাকবে। মানুষ সেদিন নিজেদের বদআমল অনুযায়ী ঘামে নিমজ্জিত হবে। (অর্থাৎ, যার পাপ বেশী হবে, তার ঘামও বেশী হবে।) তাই কিছু লোক এমন হবে যাদের ঘাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে, কিছু লোক এমন হবে যাদের ঘাম হাঁটু পর্যন্ত হবে, কিছু লোক এমন হবে যাদের ঘাম কোমর পর্যন্ত এসে যাবে, আর কিছু লোক এমনও থাকবে যাদের ঘাম মুখে লাগামের মত ঢুকতে থাকবে। এ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দিয়ে মুখের দিকে ইশারা করলেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কেয়ামত এবং আখেরাতে সংঘটিত এসব ঘটনাবলীর বাস্তব স্বরূপ ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে এ দুনিয়াতে বসে সঠিক কল্পনাও করা যায় না। এগুলোর পূর্ণ স্বরূপ তখনই প্রকাশিত হবে, যখন এসব বাস্তবতা চোখের সামনে এসে যাবে।

(٩٠) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثَلٰثَةَ اَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلٰى وُجُوْهِهِمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَمْشُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؟ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ اَمْشَاهُمْ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَمَا اِنَّهُمْ يَتَّقُوْنَ بِوُجُوْهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ * (رواه الترمذى)

৯০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে তিন ভাগে ও তিন দলে সমবেত করা হবে। একটি দল পায়ে হেঁটে, একটি দল সওয়ার হয়ে, আর একটি দল মুখের উপর ভর দিয়ে সেখানে আসবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা (তৃতীয় দলটি) মুখের উপর ভর দিয়ে কিভাবে চলতে পারবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ যে মহান সত্তা তাদেরকে পায়ের উপর চালাতে পেরেছেন তিনি তাদেরকে মুখের উপরও চালাতে সক্ষম। স্মরণ রাখা চাই যে, এরা মুখ দিয়েই ভূমির উঁচু-নীচু ও কণ্টকাকীর্ণ স্থান অতিক্রম করে আসবে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে যে তিনটি দলের উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, পদচারী দলটি হবে সাধারণ মুসলমানদের। দ্বিতীয় দল, যারা সওয়ারীতে আরোহণ করে আসবে, সেটা হবে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত পুণ্যবানদের দল, যাদেরকে সেখানে শুরু থেকেই সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হবে। আর মাথার উপর এবং মুখের উপর চলন্ত লোকগুলো হবে ঐ হতভাগার দল, যারা এ দুনিয়াতে নবী-রাসূলদের শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সোজাপথে চলার বিষয়টি গ্রহণ করেনি; বরং মৃত্যু পর্যন্ত তারা উল্টো পথেই চলেছে। কেয়ামতের দিন তাদের প্রথম শাস্তি এ ভোগ করতে হবে যে, সোজাপায়ে চলার পরিবর্তে সেখানে তাদেরকে উল্টোভাবে মুখের এবং মাথার উপর ভর দিয়ে চালানো হবে। এমনকি যেভাবে এ দুনিয়াতে পথচারীরা পথের উঁচু-নীচু এবং কাঁটা-আবর্জনা থেকে নিজের পায়ের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে চলে, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মাথার উপর ভর দিয়ে চলন্ত লোকগুলো সেখানকার উঁচু-নীচু স্থান এবং কাঁটা ইত্যাদি থেকে নিজেদেরকে মাথা ও মুখ দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ, এখানে যে কাজটি পা দিয়ে করা হয়, সেখানে আল্লাহ্র পাপী বান্দাদেরকে সে কাজটি মুখ ও মাথা দিয়ে করতে হবে।

(٩١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُوْتُ اِلَّا نَدِمَ قَالُوْا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ ازْدَادَ وَ اِنْ كَانَ مُسِيْئًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ نَزَعَ * (رواه الترمذى)

(৯১) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ দুনিয়াতে যে ব্যক্তিই মারা যাবে, সে (মৃত্যুর পর নিজের জীবনের উপর) অনুতাপ করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তার অনুতাপের কারণ কি হবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য আক্ষেপ করবে যে, সে কেন পুণ্য কাজ আরো বেশী করে করল না। আর যদি পাপাচারী হয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য আক্ষেপ করবে যে , সে কেন পাপ কাজ থেকে বিরত থাকল না। —তিরমিযী

আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিতি এবং আমলের পরীক্ষা

(٩٢) عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ * (رواه البخارى ومسلم)

৯২। আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই তার প্রতিপালক এভাবে কথা বলবেন যে, তাঁর মাঝে ও বান্দার মাঝে কোন মুখপাত্র থাকবে না এবং কোন অন্তরায়ও থাকবে না। (তখন বান্দার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, অস্থির হয়ে সে এদিক ওদিক দেখতে থাকবে।) সে যখন

ডান দিকে তাকাবে, তখন নিজের কৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। বাম দিকে যখন তাকাবে, তখনও নিজের পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তারপর যখন সামনের দিকে দৃষ্টি দিবে, তখন নিজের সামনে আগুন ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব, তোমরা এই আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর, যদিও শুকনো খেজুরের একটি টুকরো দিয়েও হয়।
—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষ কথাটির মর্ম এই যে, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা সদকা খয়রাত কর। যদি খেজুরের একটি শুকনো টুকরা ছাড়া অন্য কিছু না থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র পথে তাই বিলিয়ে দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।

শিক্ষা ঃ কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফেও যেখানে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং বিভীষিকাময় দৃশ্য ও জাহান্নামের ভীষণ আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য এটাই যে, আল্লাহ্‌র বান্দারা যেন সতর্ক হয়ে নিজেদেরকে এ অবস্থা থেকে বাঁচাবার চিন্তা ও চেষ্টা করে। এ হাদীসের শেষ দিকে তো এ উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে বলেও দেওয়া হয়েছে। তবে যেসব হাদীসে এ উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় নাই, সেখানেও বুঝে নিতে হবে যে, এর উদ্দেশ্য এটাই। তাই এ ধারার সকল আয়াত ও হাদীস থেকে আমাদেরকে এ শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে।

(٩٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؟ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِىْ سَحَابَةٍ قَالُوْا لَا قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِى سَحَابَةٍ قَالُوْا لَا قَالَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ اِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُوْلُ اَىْ فُلُ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَ اُسَوِّدْكَ وَ اُزَوِّجْكَ وَ اُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْاِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرْاَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُوْلُ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ اَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلَاقِىَّ فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ قَدْ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِىْ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُوْلُ لَهٗ مِثْلَ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ وَيُثْنِىْ بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُوْلُ هٰهُنَا اِذًا، ثُمَّ يُقَالُ اَلْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ وَ يَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهٖ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخْذِهٖ اِنْطِقِىْ فَتَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَلَحْمُهٗ وَعِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَذَالِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهٖ وَذَالِكَ الْمُنَافِقُ وَذَالِكَ الَّذِىْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ * (رواه مسلم)

৯৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব ? তিনি বললেন ঃ মেঘমুক্ত আকাশে দুপুর বেলা তোমাদের কি সূর্য দেখতে কোন অসুবিধা হয় ? তারা নিবেদন করলেন, না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে

তোমাদের কি চাঁদ দেখতে কোন অসুবিধা হয় ? তারা উত্তর দিলেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ঐ মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যেভাবে চন্দ্র-সূর্যকে নির্দ্বিধায় দেখতে পার, কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালককে সেভাবেই দেখতে পারবে।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কেয়ামতে যখন আল্লাহ্র সাথে এক বান্দার সাক্ষাত হবে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, হে অমুক! আমি কি দুনিয়াতে তোমাকে সম্মান দেই নাই ? তোমার সম্প্রদায়ের উপর তোমাকে নেতৃত্ব দেই নাই ? তোমাকে স্ত্রী দান করি নাই ? তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে (বাহনের জন্য) অনুগত করে দেই নাই ? আমি কি তোমাকে এভাবে ছেড়ে রাখি নাই যে, তুমি মানুষের নেতৃত্ব দিতে পার এবং গনীমতের মালের এক চতুর্থাংশ আদায় করতে পার। বান্দা নিবেদন করে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেন ঃ তুমি কি এই ধারণা করতে যে, একদিন আমার সাথে সাক্ষাত করতে হবে ? সে বলবে, না, আমি এ কথা মনেই করতাম না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আজ আমি তোমাকে (আমার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে) ভুলে থাকব, যেভাবে দুনিয়াতে তুমি আমাকে ভুলে থেকেছিলে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আরেক বান্দার সাথে সাক্ষাত করবেন এবং তার সাথেও এরূপ কথাবার্তা হবে। এরপর তৃতীয় এক বান্দার সাথে আল্লাহ্র সাক্ষাত হবে এবং তিনি তাকেও এভাবে জিজ্ঞাসা করবেন। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার প্রতি, আপনার কিতাবের প্রতি এবং আপনার নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছিলাম। আমি নামায পড়েছিলাম, রোযা রেখেছিলাম এবং দান-খয়রাতও করেছিলাম। এছাড়াও সে যতদূর সম্ভব নিজের আমলের কথা বলতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেন ঃ তাহলে এখানে দাঁড়াও। তারপর বলা হবে যে, আমি তোমার বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী পেশ করব। সে মনে মনে ভাববে, আমার বিরুদ্ধে আবার কে সাক্ষ্য দেবে। তারপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তার উরুকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, তুমি কথা বল। এ সময় তার উরু, তার গোশ্ত এবং তার হাড়সমূহ তার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ্ তা'আলা এটা এজন্য করবেন, যাতে তার পক্ষ থেকে কোন আপত্তি না চলে। আর এ লোকটি হবে মুনাফেক এবং তার উপর আল্লাহ্ খুবই অসন্তুষ্ট থাকবেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রশ্নকারীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেবল এতটুকু জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেয়ামতে আমরা কি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পারব ? তিনি চন্দ্র-সূর্যের উদাহরণ দিয়ে ও বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, কেয়ামতে আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন এমন স্পষ্টভাবে হবে যে, এতে কোন অস্পষ্টতা ও দ্বিধার অবকাশ থাকবে না। তিনি এ কথাটিও স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন যে, যেভাবে চন্দ্র-সূর্যকে পূর্ব-পশ্চিমের কোটি কোটি মানুষ একই সাথে দেখে এবং সকলে একইভাবে দেখে- এতে তাদের মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না, ঠিক এভাবে কেয়ামতে সবাই আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পারবে।

তারপর অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে তিনি এও বলে দিলেন যে, অনেক মানুষ— যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে বিরাট বিরাট নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন, অথচ তারা আল্লাহ্কে সম্পূর্ণরূপে ভুলে রয়েছে এবং আখেরাতে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিতি থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে

আছে, কেয়ামতে যখন তারা আল্লাহ্র সম্মুখে হাজির হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তখন তারা কেমন নিরুত্তর ও অপমাণিত হয়ে যাবে। আর এদের মধ্যে যেসব মুনাফেক জেনেশুনে নির্লজ্জের মত মিথ্যা বক্তব্য দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাদের গোশ্ত ও হাড় দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পেশ করে তাদের উপর প্রমাণ খাড়া করে ছাড়বেন। এভাবে সকল মানুষের সামনে তাদের মিথ্যা ও মুনাফেকীর হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারী সাহাবায়ে কেরামকে এই বাস্তবতার দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য এই অতিরিক্ত বিষয়টি বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, কেয়ামতে কেবল আল্লাহ্র দর্শনই হবে না; বরং তিনি যাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, সে সময় এগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ "সে দিন অবশ্যই তোমরা (আল্লাহ্প্রদত্ত) নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

তাই যে সব মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং আখেরাতের উপস্থিতি ও হিসাব-নিকাশ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দুনিয়াতে এ নেয়ামত ভোগ করেছে, সেদিন তাদের মুখ কালো হয়ে যাবে। আর সেখানে কোন প্রতারণা ও ধূর্তামি কোন দোষ লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

(٩٤) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهٗ وَيَسْتُرُهٗ فَيَقُوْلُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ! حَتّٰى قَرَّرَهٗ بِذُنُوْبِهٖ وَرَأَى فِىْ نَفْسِهٖ اَنَّهٗ قَدْ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا وَ اَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهٖ وَ اَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيُنَادِىْ بِهِمْ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ * (رواه البخارى و مسلم)

৯৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে নিজের (রহমতের) সান্নিধ্যে নিয়ে যাবেন, তার উপর নিজের বিশেষ পর্দা ঢেলে দেবেন এবং অন্যদের থেকে তাকে ঢেকে নেবেন। তারপর জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কি অমুক গুনাহর কথা স্মরণ আছে? তোমার কি অমুক গুনাহর কথা মনে আছে? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার মনে আছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল গুনাহর স্বীকৃতি আদায় করবেন। সে তখন মনে মনে চিন্তা করবে যে, আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ তোমার এসব গুনাহ দুনিয়াতে আমি গোপন রেখেছিলাম, আর আজ এগুলো ক্ষমা করে দিচ্ছি। তারপর তাকে তার পুণ্যের আমলনামা প্রদান করা হবে। (অর্থাৎ, হাশরবাসীর সামনে কেবল তার নেকীর আমলনামাই আসবে, আর গুনাহর ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলা ঐ পর্দার মধ্যে শেষ করে দেবেন।) পক্ষান্তরে কাফের এবং মুনাফেকদের ব্যাপারটি এমন হবে যে, তাদের বেলায় প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হবে ঃ এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা নিজেদের

প্রতিপালকের উপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। (অর্থাৎ, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণাকে আল্লাহ্র দিকে সম্পৃক্ত করে এরা নিজেদের ধর্মমত বানিয়ে নিয়েছিল।) শুনে রাখ! আল্লাহ্র অভিশাপ রয়েছে এ ধরনের জালেমদের উপর। —বুখারী, মুসলিম

(٩٥) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا فِيْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهٗ اَمْ يَثْقُلُ وَ عِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالَ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهٗ فِيْ يَمِيْنِهٖ اَمْ فِيْ شِمَالِهٖ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ * (رواه ابوداود)

৯৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করলেন এবং খুব কাঁদলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার এ কান্নার কারণ কি ? আয়েশা (রাঃ) নিবেদন করলেন, জাহান্নামের কথা আমার মনে পড়ল আর এ জন্যেই কান্না এসে গেল। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি কেয়ামতের দিন নিজের পরিবারের কথা মনে রাখবেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ তিনটি স্থানে তো কেউ কাউকে স্মরণ করবে না (এবং কারো খোঁজখবর নেবে না) ঃ (১) আমল ওজন করার সময়, যে পর্যন্ত এটা জানা না যাবে যে, তার আমলের ওজন হাল্কা হল না ভারী। (২) আমলনামা প্রদান করার সময়— যখন বলা হবে, আস, তোমরা আমার আমলনামাটি পড়ে দেখ—যে পর্যন্ত সে জানতে না পারবে যে, আমলনামাটি কোথায় দেওয়া হয়– ডান হাতে নাকি পেছনের দিক দিয়ে বাম হাতে। (৩) পুলছিলাতের উপর— যখন তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে (এবং সবাইকে এর উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে বলা হবে)। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের মূল বক্তব্য হল এই যে, তিনটি সময় এমন সংকটময় হবে যে, সবাই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে এবং কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে না। (১) আমল ওজন করার সময়, যে পর্যন্ত এর ফলাফল জানা না যাবে। (২) যে সময় সবাই আমলনামার অপেক্ষায় থাকবে এবং সবাই এ চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে যে, আমলনামা কি ডান হাতে দেওয়া হবে, না বাম হাতে এবং সে কি মাগফেরাত ও রহমতের অধিকারী হবে, না অভিশাপ ও আযাবের যোগ্য হবে। (৩) সে সময়টি, যখন জাহান্নামের উপর পুলছিরাত স্থাপন করা হবে এবং এর উপর দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। এ তিনটি সময় এমন সংকটময় হবে যে, সবার মুখেই কেবল নাফসী নাফসী উচ্চারিত হবে, সবাই নিজের চিন্তায় ডুবে থাকবে এবং কেউ কারো খোঁজ-খবর নিতে পারবে না।

এ হাদীসটির সার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর উদ্দেশ্য এটাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন আখেরাতের চিন্তা করে এবং কেউ যেন অন্য কারো ভরসায় বসে না থাকে।

কেয়ামতে বান্দার হকের বিচার

(٩٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَمْلُوْكِيْنَ يُكَذِّبُوْنَنِىْ وَيَخُوْنُوْنَنِىْ وَيَعْصُوْنَنِىْ وَ اَشْتِمُهُمْ وَاَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ اَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَعِقَابُكَ اِيَّاهُمْ فَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَ لَا عَلَيْكَ وَ اِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ دُوْنَ ذَنْبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِىْ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا تَقْرَءُ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ، فَقَالَ الرَّجُلُ مَا اَجِدُ لِىْ وَلِهٰؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُمْ كُلُّهُمْ اَحْرَارٌ *

(رواه الترمذى)

৯৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর সামনে বসে পড়ল এবং জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কয়েকটি গোলাম আছে। তাদের অবস্থা হচ্ছে, তারা অনেক সময় আমার সাথে মিথ্যা বলে, আমার সম্পদে খেয়ানত করে এবং আমার অবাধ্যতাও করে। অপরদিকে তাদের এ আচরণের কারণে আমিও তাদেরকে গালি দেই এবং মারপিটও করি। তাই কেয়ামতের দিন আমার মধ্যে এবং তাদের মধ্যে ইনছাফ কিভাবে হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমার গোলামদের কারচুপি, তাদের অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারকে তোমার শাস্তির সাথে ওজন করা হবে। ওজনের পরে যদি দেখা যায় যে, তাদেরকে তুমি যে শাস্তি দিয়েছ, তা তাদের অপরাধের সমান, তাহলে বিষয়টি সমান সমান হয়ে শেষ হয়ে যাবে। আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়ে থাকে, তাহলে তোমার বাড়তি হক সেখানে পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে, তাহলে তোমার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এ কথা শুনে সে এক দিকে সরে গিয়ে কাঁদতে লাগল। (অর্থাৎ, কেয়ামতের এই বিচার ও শাস্তির ভয়ে তার উপর যখন কান্নার ভাব এসে গেল, তখন সে আদব রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখ থেকে উঠে গেল এবং এক দিকে সরে গিয়ে কান্না ও চিৎকার শুরু করল।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাকে বললেন ঃ তুমি কি কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীটি পড় নি ? যার অর্থ হচ্ছে ঃ কেয়ামতের দিন আমি ইনছাফ ও ন্যায়-বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন ধরনের জুলুম হবে না। যদি কারো কোন আমল অথবা হক সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তাও উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।

এ কথা শুনে লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার জন্য এবং তাদের জন্য এর চাইতে উত্তম কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ করে দিয়ে আমি মুক্ত হয়ে যাই। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, এদের সবাইকে আমি আযাদ করে দিলাম, এখন এরা স্বাধীন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ ঈমানের দাবী এটাই, আর খাঁটি ঈমানদারদের কর্মপদ্ধতি এটাই হওয়া উচিত যে, যে জিনিসের মধ্যে আখেরাতের ক্ষতির আশংকা দেখবে, সে জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে– দুনিয়ার দৃষ্টিতে এতে যত ক্ষতিই দেখা যাক না কেন।

আল্লাহ্‌র নামের ওজন

(৯৭) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ اُمَّتِيْ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِيْ الْحَافِظُوْنَ فَيَقُوْلُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ قَالَ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَ اِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلاَّتِ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِيْ كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِيْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اِسْمِ اللّٰهِ شَيْءٌ * (رواه الترمذى وابن ماجه)

৯৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে সকল সৃষ্টির সামনে বের করে আনবেন। তারপর তার সামনে নিরানব্বইটি নথি (প্রতি দিনের কার্যবিবরণী) খুলে ধরবেন– যার একেকটি নথির দৈর্ঘ হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রলম্বিত। (এগুলো হবে তার আমলনামা।) তারপর তাকে বলা হবে যে, এই নথিসমূহে তোমার যে আমল লিপিবদ্ধ রয়েছে, এগুলোর কোনটা কি তুমি অস্বীকার কর ? তোমার আমল সংরক্ষণকারী ফেরেশ্‌তারা কি তোমার উপর কোন জুলুম করেছে (এবং ভুলক্রমে কোন গুনাহ্ তোমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে ?) সে উত্তর দিবে, না, হে আমার প্রতিপালক! (কেউ আমার উপর জুলুম করেনি; বরং এগুলো আমারই কৃতকর্ম।) আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কি কোন ওযর-আপত্তি আছে ? সে উত্তর দিবে, হে আমার রব! আমার কোন ওযর-আপত্তিও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেন ঃ হ্যাঁ, আমার কাছে তোমার একটি বিশেষ পুণ্য রয়েছে, আর তোমার উপর কোন অবিচার করা হবে না (এবং ঐ পুণ্যের লাভ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করা হবে না।) এই কথা বলার পর কাগজের একটি টুকরা বের করা হবে, যেখানে কালেমায়ে শাহাদত লেখা থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ বান্দাকে বলবেন ঃ তোমার আমল ওজন করার স্থানে উপস্থিত হও। (অর্থাৎ, তুমি উপস্থিত থেকে নিজের সামনে আমল ওজন করিয়ে নাও।) সে বলবে, হে আমার রব! এই বিরাট বিরাট খাতার সামনে এ

ছোট্ট কাগজের অস্তিত্বই কতটুকু থাকবে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার উপর অবিচার করা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারপর এ নিরানব্বইটি নথিপত্র এক পাল্লায় এবং এ কাগজের টুকরাটি অন্য পাল্লায় রাখা হবে। দেখা যাবে যে, খাতায় ভরা পাল্লাটি হাল্কা হয়ে গিয়েছে এবং কাগজের টুকরার পাল্লাটি ভারী হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নামের উপর কোন জিনিসই ভারী হতে পারে না। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যাতা এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এখানে ঐ শাহাদতের কালেমাকে পাল্লায় রাখা হবে, যা কুফর ও শিরক থেকে বের হয়ে ঈমান ও ইসলামে প্রবেশ করার জন্য প্রথমবার মুখ ও অন্তর দিয়ে পাঠ করা হয়েছিল। কেয়ামতে আমল ওজন করার সময় তার এ প্রভাব ও শক্তি প্রকাশ পাবে যে, পূর্বেকৃত সারা জীবনের গুনাহ্ এর প্রভাবে ওজনহীন ও প্রভাবহীন হয়ে পড়বে। পূর্বেও একটি হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

এ হাদীসের অন্য একটি ব্যাখ্যা এও করা হয় যে, এ ব্যাপারটি ঐ ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, যে দীর্ঘকাল যাবত আখেরাত থেকে উদাসীন ও বেপরওয়া থেকে গুনাহ্র উপর গুনাহ্ করে গিয়েছে এবং খাতার পর খাতা লিখা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ পাক তাকে তওফীক দিয়েছেন এবং সে অন্তরের গভীরতা থেকে এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে এ কালেমার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের ঈমানী সম্পর্ক ঠিক করে নিয়েছে এবং এর উপরই তার মৃত্যু হয়েছে।

সহজ হিসাব

(৯৮) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلٰوَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَسِيْرًا قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ قَالَ اَنْ يَنْظُرَ فِىْ كِتَابِهٖ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ اِنَّهٗ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ * (رواه احمد)

৯৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোন কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দো'আ করতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমার কাছ থেকে তুমি সহজ হিসাব গ্রহণ কর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! সহজ হিসাবের অর্থ কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ সহজ হিসাবের অর্থ হচ্ছে এই যে, বান্দার আমলনামায় কেবল দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে, আর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (অর্থাৎ, কোন জিজ্ঞাসাবাদ ও কৈফিয়ত তলব করা হবে না।) হে আয়েশা! সেদিন যাকে হিসাবের বেলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (তার আর রক্ষা নেই,) সে ধ্বংস হয়ে যাবে। —মুসনাদে আহমাদ

মু'মিনদের জন্য কেয়ামতের দিনটি হাল্কা ও সংক্ষিপ্ত হবে

(৯৯) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىْ اَنَّهٗ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَنْ يَقْوٰى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ * (رواه البيهقى فى البعث والنشور)

৯৯। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আমাকে বলুন, কেয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) দীর্ঘ সময় কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ? যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "সে দিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালনকর্তার সামনে।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ খাঁটি মু'মিনের জন্য এ সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হবে। এমনকি এটা তার নিকট কেবল একটি ফরয নামায আদায় করার সময়ের মত মনে হবে। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সায়ীদ খুদরীকে যে উত্তর দিয়েছেন, এ ইঙ্গিত কুরআন মজীদেও পাওয়া যায়। সূরা মুদ্দাস্সিরে বলা হয়েছে ঃ "যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সে দিনটি হবে কঠিন দিন, কাফেরদের জন্য এটা সহজ নয়।"

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ কঠিন দিনটি ঈমানদারদের জন্য কঠিন হবে না; বরং তাদের জন্য হাল্কা ও সহজ করে দেওয়া হবে।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণকারীরা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে

(١٠٠) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ فَيَقُوْلُ اَيْنَ الَّذِيْنَ كَانَتْ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُوْمُوْنَ وَهُمْ قَلِيْلٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يُؤْمَرُ سَائِرُ النَّاسِ اِلَى الْحِسَابِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১০০। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একটি প্রশস্ত ময়দানে সমবেত করা হবে। (অর্থাৎ, সবাই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।) তারপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, ঐ লোকগুলো কোথায়, যাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক থাকত ? (অর্থাৎ, নিজেদের বিছানা ছেড়ে দিয়ে যারা তাহাজ্জুদ আদায় করত।) এই আহ্বান শুনে তারা দাঁড়িয়ে যাবে, আর তারা সংখ্যায় হবে কম। তারা আল্লাহ্র হুকুমে বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। অবশিষ্ট লোকদেরকে হিসাবের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। —বায়হাকী

উম্মতে মুহাম্মদীর এক বিরাট সংখ্যা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে

(١٠١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ اَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَثَلٰثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّىْ * (رواه احمد والترمذى وابن ماجة)

১০১। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার মানুষকে বিনা হিসাবে এবং বিনা শাস্তিতে জান্নাতে দাখিল

করবেন। আর এদের প্রতি হাজারের সাথে থাকবে আরো সত্তর হাজার। আবার এর উপর থাকবে আমার প্রতিপালকের মুঠা ভরে তিন মুঠা। —মুসনাদে আহ্মাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

হাদীসটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি উম্মতে মুহাম্মদী থেকে সত্তর হাজার মানুষকে বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে দাখিল করবেন। তারপর এ সত্তর হাজারের মধ্য থেকে প্রতি এক হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার এভাবে বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বিশেষ অনুগ্রহে এ উম্মতের এক বিরাট সংখ্যক লোককে আরো তিন দফায় জান্নাতে পাঠাবেন। আর এরা সবাই ঐ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে যারা বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাউযে কাওছার, পুলসিরাত ও মীযান প্রসঙ্গ

হাদীসে আখেরাতের যেসব জিনিসের নামোল্লেখসহ আলোচনা করা হয়েছে এগুলোর মধ্যে এ তিনটি জিনিসও রয়েছে ঃ (১) হাউযে কাওছার, (২) পুলছিরাত ও (৩) মীযান।

কাওছারকে কোন কোন হাদীসে হাউয শব্দ যোগ করে 'হাউযে কাওছার' বলা হয়েছে। আবার কোন কোন হাদীসে নহর শব্দ যোগে 'নহরে কাওছার'ও বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন কোন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হাউযে কাওছার জান্নাতের ভিতরে অবস্থিত। আবার অধিকাংশ হাদীস দ্বারা এ সন্ধান পাওয়া যায় যে, এর অবস্থান জান্নাতের ভিতরে নয়; বরং বাইরে। ঈমানদাররা জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে এ হাউযে কাওছারেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করে তাঁর পবিত্র হাতে এর স্বচ্ছ ও সুস্বাদু পানি পান করবে।

সঠিক তথ্য এই যে, কাওছারের মূল ও কেন্দ্রীয় ঝর্ণাটি জান্নাতের ভিতরে অবস্থিত এবং জান্নাতের চতুর্দিকে এর শাখাসমূহ নহরের আকৃতিতে প্রবহমান। আর যেটাকে 'হাউযে কাওছার' বলা হয়, সেটা হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অনুপম সুন্দর জলাধার, যা জান্নাতের বাইরে অবস্থিত। কিন্তু এর সম্পর্ক ও সংযোগ জান্নাতের অভ্যন্তরের ঐ ঝর্ণার সাথেই। তাই এখানে যে পানি থাকবে সেটা জান্নাতের ঐ ঝর্ণাধারার পানিই যা নহরের মাধ্যমে এখানে এসে জমা হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হাউয শব্দ বললে সাধারণতঃ মানুষের চিন্তা ঐ ধরনের হাউযের দিকেই যায়, যে ধরনের হাউয তারা দুনিয়ায় দেখে থাকে। কিন্তু হাউযে কাউছার তার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও সুষমার কারণে দুনিয়ার হাউযের তুলনায় এতটুকু উন্নত তো হবেই, দুনিয়ার কোন জিনিসের তুলনায় আখেরাতের জিনিস যতটুকু উন্নত হওয়া চাই। কিন্তু এছাড়াও হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এর পরিধি ও পরিসর এত বিস্তৃত হবে যে, একজন পথিক এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছতে চাইলে তার একমাস সময় লাগবে। অন্য এক হাদীসে এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব বোঝানোর জন্য 'আদন' এবং 'ওমানের' মধ্যকার দূরত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যাহোক, আখেরাতের বিষয়াবলী সম্পর্কে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, এর আলোকেও এসব জিনিসের সঠিক কল্পনা এ দুনিয়াতে থেকে করা যায় না। এসব জিনিসের বাস্তব স্বরূপ কেবল চোখের সামনে আসলেই জানা যাবে। এ কথাটি পুলছিরাত, মীযান ইত্যাদির ব্যাপারেও সত্য।

(١٠٢) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ اِذَا اَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قُبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرَئِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ فَاِذَا طِيْنُهُ مِسْكٌ اَذْفَرُ * (رواه البخارى)

১০২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আমি জান্নাতে বিচরণ করছিলাম, তখন হঠাৎ একটি সুন্দর নহর দেখতে পেলাম, যার উভয় পার্শ্বে উন্নত মোতির তৈরী গম্বুজ রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কি ? তিনি উত্তর দিলেন, এটা হচ্ছে ঐ কাওছার, যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন। আমি দেখলাম যে, এর মাটি (যা এর তলদেশে রয়েছে) মেশকের মত সুগন্ধযুক্ত। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে ভ্রমণ করতে গিয়ে নহরে কাওছার অতিক্রম করার যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সম্ভবতঃ এটা মে'রাজ রজনীর ঘটনা। আর জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে যে বলেছেন, 'এটা হচ্ছে ঐ কাওছার, যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন', এর দ্বারা কুরআন পাকের ঐ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, 'আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি'।

কাওছারের আসল অর্থ প্রচুর কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণের যে ভান্ডার দান করেছেন, যেমন ঃ কুরআন ও শরীঅত, উচ্চতর আত্মিক গুণাবলী এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর উচ্চ আসন ইত্যাদি, এগুলোও কাওছারের ব্যাপক অর্থ অর্থাৎ প্রচুর কল্যাণের মধ্যেই শামিল। কিন্তু জান্নাতের এ নহর এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐ হাউয, যা হাশরের ময়দানে থাকবে (এবং যেখান থেকে আল্লাহ্র অসংখ্য বান্দা তৃপ্তি সহকারে পানি পান করবে,) এটাই হচ্ছে কাওছার শব্দের আসল ও মূল প্রয়োগক্ষেত্র।

বিষয়টি এভাবেও বুঝে নেওয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীন ও ঈমানের যে অমূল্য নেয়ামতসমূহ দান করেছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে এগুলো আল্লাহ্র অগণিত বান্দাদের কাছে পৌঁছেছিল, আখেরাতে এগুলোর প্রকাশ এ নহরে কাওছার ও হাউযে কাওছারের আকারে ঘটবে, যা থেকে আল্লাহ্র অসংখ্য বান্দা কল্যাণপ্রাপ্ত ও পরিতৃপ্ত হবে।

(١٠٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ مَاءُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَّشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا * (رواه البخارى ومسلم)

১০৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার হাউযের পরিধি এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। (অর্থাৎ, আল্লাহ্

তা'আলা আমাকে যে হাউযে কাওছার দান করেছেন সেটা এত দীর্ঘ ও গভীর যে, এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে এক মাস সময় লাগবে।) এবং এর পার্শ্বসমূহ সমান। (এর অর্থ বাহ্যতঃ এই মনে হয় যে, এটা হবে চতুষ্কোণবিশিষ্ট এবং দৈর্ঘ-প্রস্থে সমান।) এর পানি হবে দুধের চেয়েও শুভ্র, এর সুঘ্রাণ হবে মেশকের চেয়েও বেশী, আর এর পেয়ালা হবে আকাশের তারকার ন্যায়। (সম্ভবতঃ এর অর্থ এই যে, আকাশের তারকা যেমন সুন্দর, উজ্জ্বল ও অগণিত, অনুরূপভাবে আমার হাওযের পেয়ালাও হবে সুন্দর, উজ্জ্বল ও অগণিত।) যে এখান থেকে পানি পান করবে, সে কখনো পিপাসা অনুভব করবে না। —বুখারী, মুসলিম

(١٠٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَ مَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا سَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَ يَعْرِفُوْنَنِىْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِّمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ *

(رواه البخارى ومسلم)

১০৪। হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি হাউযে কাওছারে তোমাদের জন্য পূর্ব থেকেই অপেক্ষমান থাকব। (অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে আমি তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করে রাখব।) সেখানে যে আমার কাছে আসবে, সে কাওছারের পানি পান করবে। আর যে এই পানি পান করবে, সে আর পিপাসা অনুভব করবে না।

সেখানে আমার কাছে এমন কিছু লোকও আসবে, যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু আমার মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে (এবং তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না। তখন আমি বলব যে, এরা তো আমারই লোক; কিন্তু আমাকে বলে দেওয়া হবে যে, আপনি তো জানেন না, আপনার পর তারা নতুন নতুন কিসব বিষয় আবিষ্কার করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হোক তারা, দূর হোক, যারা আমার পরে দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যেসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা হাউযে কাওছারের নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হবে। এরা কারা এবং কোন্ শ্রেণীর লোক, এটা নির্দিষ্ট করে বলা খুবই কঠিন। তবে এটা জানাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। এ হাদীসটির বিশেষ শিক্ষা আমাদের জন্য কেবল এতটুকুই যে, আমরা যদি হাউযে কাওছারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকি, তাহলে আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে দ্বীনের উপর কায়েম থাকতে হবে এবং দ্বীনের মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কোন নতুন সংযোজন ও পরিবর্তন করা যাবে না।

(١٠٥) عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضِىْ مِنْ عَدَنَ اِلٰى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاءُهٗ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَكْوَابُهٗ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ

بَعْدَهَا اَبَدًا اَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُؤُسًا الدُّنُسُ ثِيَابًا اَلَّذِيْنَ لاَ يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَ يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ * (رواه احمد والترمذى و ابن ماجة)

১০৫। হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার হাওযের পরিধি আদন থেকে বালকার আম্মান পর্যন্ত দূরত্বের ন্যায় বিস্তৃত। এর পানি দুধের চেয়েও বেশী সাদা এবং মধুর চেয়েও বেশী সুমিষ্ট। এর গ্লাসের সংখ্যা আকাশের তারকার ন্যায়। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, যে এখান থেকে একবার পানি পান করবে, এরপর তার আর কখনো পিপাসার কষ্ট হবে না। এই হাউযে সর্বপ্রথম যারা পানি পান করতে আসবে, তারা হচ্ছে ঐসব দরিদ্র মুহাজির, যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, গায়ের কাপড়ও ময়লা। যারা বড় ঘরের মেয়েদের বিয়ে করতে পারে না এবং তাদের জন্য দরজা খোলা হয় না। (অর্থাৎ, তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কেউ বরণ করে নেয় না।) —আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ আদন একটি প্রসিদ্ধ বন্দর, (যা এডেন নামেও পরিচিত।) আম্মান জর্ডানের রাজধানী তথা বৃহত্তর শাম অঞ্চলের প্রসিদ্ধ নগরী। বাল্কা আম্মানের নিকটবর্তী এক জনপদের নাম। সুস্পষ্ট পরিচয় ও চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে হাদীসে 'বাল্কার আম্মান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কথাটির মর্ম এই যে, এ পৃথিবীতে আদন এবং বাল্কার নিকটবর্তী আম্মানের মধ্যে যতটুকু দূরত্ব, আখেরাতে হাউযে কাউছারের পরিধিও সে অনুপাতেই বিরাট হবে।

একথাও মনে রাখা দরকার যে, হাউযে কাউছার ঠিক এত মাইল এত ফার্লং এবং এত ফুট হবে এটা বলাও এখানে উদ্দেশ্য নয়; বরং হাউযে কাউছারের বিস্তৃতি বুঝানোর জন্যই এ আনুমানিক পরিমাপের কথা বলা হয়েছে। আসল অর্থ হচ্ছে এই যে, হাউযের পরিধি হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

হাদীসের শেষভাগে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম হাউযে কাউছারে আগমনকারী এবং এখান থেকে পানি পান করে তৃপ্তিলাভকারী লোকগুলো হবে দরিদ্র মুহাজির শ্রেণীর। যারা নিজেদের দারিদ্র্য এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণে এ অবস্থায় জীবন যাপন করে যে, তাদের মাথার চুল খুব বিন্যস্ত থাকে না এবং গায়ের কাপড়ও খুব উজ্জ্বল থাকে না। এ অবস্থার কারণে সুখী ঘরের মেয়েদেরকে তাদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় না। তারা কারো বাড়ীতে গেলে তাদের জন্য কেউ দরজাও খুলতে চায় না।

হাদীসটি দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ্র যে সকল বান্দার এ অবস্থা যে, দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ত ও দ্বীনি কাজের ব্যস্ততা এবং পরকাল চিন্তার প্রাবল্যের কারণে এ দুনিয়ায় তারা গরীবী জীবন কাটায়। যারা নিজেদের চেহারা-আকৃতি সুন্দর করার চিন্তাও করে না এবং লেবাস-পোশাক পরিপাটি করার পেছনেও লেগে থাকে না, তারা দুনিয়ার এ ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেওয়ার বদৌলতে আখেরাতের পুরস্কার লাভে সবার উপরে এবং সবার চেয়ে অগ্রগামী থাকবে।

আমাদের এ যুগে যেসব লোক অজ্ঞতার কারণে জীবন ধারনের এই পদ্ধতিকে শুষ্ক বুযুর্গী বা 'বৈরাগ্যপ্রীতি' অথবা দ্বীনের স্বরূপ না বুঝার ফল মনে করে থাকে, তারা যেন এ হাদীস সামনে রেখে একটু চিন্তা-ভাবনা করে।

প্রত্যেক যুগেই (দ্বীনি ক্ষেত্রে) কিছু ভুল বোঝাবুঝি দেখা যায়। এক সময় কোন কোন মহলে বৈরাগ্য ও দুনিয়া বর্জনের ভ্রান্ত এবং ইসলাম বিরোধী প্রক্রিয়াসমূহকে ইসলামের পছন্দনীয় ধার্মিকতা বলে প্রচার করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। বর্তমান যুগে কোন কোন মহল এর বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষাকে এ যুগের জড়বাদী চিন্তা ও ভোগবাদী চেতনার সাথে খাপ খাওয়ানোর অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই ভারসাম্যপূর্ণ সরল সঠিক পথের সন্ধান দেন।

(١٠٦) عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَ اِنَّهُمْ لَيَتَبَاهُوْنَ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ وَارِدَةً وَ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً * (رواه الترمذى)

১০৬। হযরত সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আখেরাতে প্রত্যেক নবীরই একটি হাউয থাকবে। তাঁরা পরস্পর এ নিয়ে গর্ববোধ করবেন যে, কার হাউযে বেশী লোক পানি পান করতে আসে। আমি আশা করি যে, আমার কাছেই বেশী লোকের সমাগম হবে এবং আমার হাউয থেকেই অধিক সংখ্যক লোক পানি পান করে তৃপ্ত হবে। —তিরমিযী

(١٠٧) عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ اَنَا فَاعِلٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ اَطْلُبُكَ قَالَ اُطْلُبْنِيْ اَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِيْ عَلَى الصِّرَاطِ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْحَوْضِ فَاِنِّيْ لَا اُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلٰثَ الْمَوَاطِنَ * (رواه الترمذى)

১০৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করতে অনুরোধ জানালাম। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি তোমার জন্য এ কাজ করব। আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কেয়ামতের দিন কোথায় আপনাকে তালাশ করব ? তিনি বললেন ঃ সর্বপ্রথম আমাকে পুলছিরাতে খুঁজবে। আমি প্রশ্ন করলাম, সেখানে যদি আপনার সাক্ষাত না পাই ? তিনি বললেন ঃ তাহলে মীযানের কাছে আমাকে খুঁজবে। আমি আবার আরয করলাম, মীযানের কাছেও যদি আপনাকে না পাই ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাহলে আমাকে হাউযে কাউছারের পাশে তালাশ করবে। কেননা, আমি তখন এ তিন স্থানের বাইরে কোথাও থাকব না। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আখেরাতের শাফা'আত এমন জিনিস যে, এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করা যায়। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী হযরত আনাসকে নিজের সাক্ষাতস্থলের কথা বলে দেওয়ার মাধ্যমে এ উম্মতের সকল শাফাআতপ্রার্থীকেই নিজের ঠিকানা বলে দিয়েছেন।

(১০৮) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ * (رواه الترمذى)

১০৮। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন পুলছিরাতের উপর মুমিনদের বিশেষ ওযীফা হবে এ বাক্যটি ঃ রাব্বি সাল্লিম সাল্লিম। অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তিতে রাখ এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আমাদেরকে পার করে দাও। —তিরমিযী

শাফাআত প্রসঙ্গ

হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য যেসব ঘটনাবলীর সংবাদ হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলোর উপর একজন মু'মিনের বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী, এর মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত। শাফাআত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ এত অধিক সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, এর সবগুলো একত্রিত করে ধরলে বিষয়টি 'মুতাওয়াতির' বা প্রচুর বর্ণনাসমৃদ্ধ বলে গণ্য করতে হয়। আর এমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টিও অকাট্য হয়ে থাকে।

শাফাআত সংক্রান্ত এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত কয়েক ধরনের হবে এবং একাধিকবার তিনি শাফাআত করবেন। সর্বপ্রথম যখন হাশরের অধিবাসীরা মহান আল্লাহ্র প্রতাপ দেখে হতবুদ্ধি ও শংকিত হয়ে পড়বে এবং কারো ঠোঁট নাড়াবার সাহস পর্যন্ত হবে না, হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল বিশিষ্ট নবী-রাসূলগণও নফ্সী, নফ্সী বলতে থাকবেন এবং কারো জন্য শাফাআতের সাহস করবেন না। সেই মুহূর্তে সকল হাশরবাসীর অনুরোধে এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর ভরসা করে অগ্রসর হবেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে মহান আল্লাহ্র দরবারে সমগ্র হাশরবাসীর জন্য শাফাআত করবেন, যেন তাদেরকে এ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাদের হিসাব-কিতাব ও বিচার সম্পন্ন করা হয়।

মহান আল্লাহ্র দরবারে সে দিন এটাই হবে সর্বপ্রথম শাফাআত এবং এই শাফাআত কেবল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই করবেন। এরপরই হিসাব ও বিচার শুরু হয়ে যাবে। এ শাফাআতটি যেহেতু সমগ্র হাশরবাসীর জন্যই হবে, তাই এটাকে 'শাফাআতে কুবরা'বা মহা সুপারিশও বলা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের বিভিন্ন স্তরের লোকদের জন্য শাফাআত করবেন, যারা নিজেদের পাপাচারের দরুন জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত হবে অথবা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। তিনি আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করবেন যে, এদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক এবং জাহান্নাম থেকে এদেরকে বের করে আনার অনুমতি দেওয়া হোক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই শাফাআতও গ্রহণ করবেন। এর ফলে গুনাহ্গার উম্মতের একটা বিরাট সংখ্যা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে।

এছাড়া উম্মতের কিছু পুণ্যবান লোকের জন্য তিনি এ শাফাআতও করবেন যে, এদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হোক। অনুরূপভাবে তিনি আপন উম্মতের

অনেকের বেলায় তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাবেন। হাদীস শরীফে শাফাআতের এ সকল প্রকারভেদ ও ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে।

তারপর হাদীস দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে শাফাআতের দরজা খুলে যাওয়ার পর অন্যান্য নবী-রাসূল, ফেরেশ্তাগণ এবং আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত পুণ্যবান বান্দারাও অনেক ঈমানদারদের জন্য শাফাআত করবেন। এমনকি শিশুকালে মৃত্যুবরণকারী নিষ্পাপ সন্তানরাও তাদের ঈমানদার পিতা-মাতার জন্য শাফাআত করবে। অনুরূপভাবে কোন কোন নেক আমলও তার আমলকারীর জন্য শাফাআত করবে, আর এ শাফাআত ও সুপারিশগুলোও কবূল করে নেওয়া হবে। সেদিন বহু সংখ্যক লোক এমন দেখা যাবে, যাদের মুক্তি ও ক্ষমা এ ধরনের শাফাআতের ওসীলাতেই হবে।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এসব সুপারিশ আল্লাহ্র অনুমতি এবং তাঁর ইচ্ছায়ই হবে। অন্যথায় কোন নবী অথবা ফেরেশতার এই ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সম্মতি ছাড়া কোন একজন মানুষকেও জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবে অথবা তাঁর অনুমতি ও ইশারা না পেয়ে কারো বেলায় সুপারিশ করার জন্য মুখ খুলবে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ "এমন কে আছে যে, তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে ?" (সূরা বাকারা) অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ "তারা সুপারিশ করতে পারবে না, তবে কেবল তাদের জন্য, যাদের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে।" (সূরা আম্বিয়া)

ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, শাফাআত কর্মটি আসলে শাফাআতকারীদের মাহাত্ম্য ও তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ করার জন্য এবং তাদের সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলার কাজে এবং তাঁর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কার আছে ? আল্লাহ্র শান তো হচ্ছে ঃ তিনি যা ইচ্ছা তা করেন এবং তিনি যা চান তারই নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

ভূমিকার পর এখন শাফাআত সংক্রান্ত হাদীসগুলো পাঠ করুন।

(١٠٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اِشْفَعْ اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِاِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّهٗ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَاِنَّهٗ كَلِيْمُ اللّٰهِ فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَاِنَّهٗ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ، فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَاْتُوْنِيْ فَاَقُوْلُ اَنَا لَهَا فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ وَيُلْهِمُنِيْ مَحَامِدَ اَحْمَدُهٗ بِهَا لَا تَحْضُرُنِيْ اَلْاٰنَ فَاَحْمَدُهٗ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَاَخِرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ فَيُقَالُ اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهٗ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ فَيُقَالُ اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ

كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَانْطَلِقُ فَافْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهٗ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ فَيُقَالُ اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ اَدْنٰى اَدْنٰى اَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَانْطَلِقُ فَافْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِىْ فِيْمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَيْسَ ذَالِكَ لَكَ وَلٰكِنْ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَكِبْرِيَائِىْ وَعَظْمَتِىْ لَاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ * (رواه البخارى ومسلم)

১০৯। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কেয়ামতের দিন আসবে, তখন মানুষের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গের মত অবস্থা এবং ভীষণ অস্থিরতা দেখা দেবে। তখন তারা (অর্থাৎ, হাশরবাসীদের কিছু প্রতিনিধি) আদম আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হবে এবং নিবেদন করবে, আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, (যাতে এ অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে যাই।) আদম (আঃ) উত্তর দিবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি আল্লাহ্র খলীল ও বন্ধু। (হয়তো তিনি তোমাদের কাজে আসবেন।) অতএব, তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হবে (এবং তাঁর সামনে শাফাআতের প্রস্তাব রাখবে।) তিনিও উত্তর দিবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি আল্লাহ্র সাথে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য অর্জনকারী। তাই তিনি হয়তো তোমাদের কাজ করে দিতে পারবেন। এবার তারা মূসা (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হবে (এবং নিজেদের আবেদন তাঁর কাছে পেশ করবে।) তিনিও একই উত্তর দেবেন যে, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি রূহুল্লাহ্ এবং কালিমাতুল্লাহ। (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মানব সৃষ্টির নির্ধারিত ও সাধারণ পদ্ধতির বাইরে কেবল নিজের হুকুমে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে অসাধারণ রূহ ও আধ্যাত্মিকতা দান করেছেন। এ কথা শুনে তারা ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হবে (এবং শাফাআত করার জন্য অনুরোধ করবে।) তিনিও এ কথাই বলবেন যে, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং (আল্লাহ্র শেষ নবী) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খেদমতে যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন তারা আমার কাছে আসবে (এবং শাফাআত করার জন্য অনুরোধ জানাবে।) আমি বলব, হ্যাঁ, এই কাজের জন্য আমি আছি (এবং এটা আমারই কাজ।) অতএব, আমি আল্লাহ্র খাছ দরবারে হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করব এবং আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন আল্লাহ্র খাছ দরবারে হাজির হব, তখন তিনি আমাকে এমন কিছু প্রশংসাসূচক বাক্য শিখিয়ে দেবেন, যা এখন আমি জানি না। আমি সে বাক্যগুলো দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করতে থাকব এবং তাঁর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। (মুসনাদে আহমাদের

এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি সেখানে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সেজদায় পড়ে থাকবেন। তারপর) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হবে ঃ হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন করুন, যা বলার আছে বলুন, আপনার বক্তব্য শোনা হবে। যা চাওয়ার আছে চান, আপনাকে দেওয়া হবে। যা সুপারিশ করার আছে করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

অতএব, আমি বলব, হে পরওয়ারদেগার! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (অর্থাৎ, আমার উম্মতের উপর আপনি দয়া করুন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।) তখন আমাকে বলা হবে, আপনি যান এবং যার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমানও আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসুন। আমি গিয়ে তাই করব। (অর্থাৎ, যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমানের নূর আছে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসব।) তারপর আমি আল্লাহ্র অনুগ্রহের দরবারে ফিরে আসব এবং পূর্বের শেখানো স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁর প্রশংসা করব এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। এবারও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনি মাথা উত্তোলন করুন। যা বলার আছে বলুন, আপনার বক্তব্য শোনা হবে। যা চাওয়ার আছে প্রার্থনা করুন। আপনাকে তাই দেওয়া হবে। যা সুপারিশ করার আছে করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলব, হে পরওয়ারদেগার। আমার উম্মত! আমার উম্মত! সে সময় আমাকে বলা হবে, আপনি যান এবং যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ (অথবা বলেছেন যে, সরিষার দানা পরিমাণ) ঈমান আছে তাদেরকেও বের করে নিয়ে আসুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নির্দেশমত আমি সেখানে যাব এবং তাই করব। (অর্থাৎ, যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানও আছে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসব।) তারপর আবার আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের দরবারে ফিরে আসব এবং ঐসব স্তুতিবাক্য দ্বারাই আল্লাহ্র প্রশংসাবাদ করব। তারপর আবার সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে এবারও বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনি মাথা উত্তোলন করুন। যা বলার আছে বলুন, আপনার বক্তব্য শোনা হবে। যা চাওয়ার আছে প্রার্থনা করুন, আপনাকে তাই দেওয়া হবে। যা সুপারিশ করার আছে করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আমি এবারও বলব, হে পরওয়ারদেগার। আমার উম্মত! আমার উম্মত! আমাকে আবার বলা হবে, আপনি যান এবং যাদের অন্তরে সরিষার দানার চাইতেও কম ঈমান আছে তাদেরকেও বের করে নিয়ে আসুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নির্দেশমত আমি যাব এবং এমনই করব। তার পর চতুর্থবারের মত আমি আবারও আল্লাহ্র অনুগ্রহের দরবারে ফিরে আসব এবং ঐসব স্তুতিবাক্যের দ্বারা আল্লাহ্র প্রশংসাবাদ করব। তারপর তাঁর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। এবারও আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনি মাথা উত্তোলন করুন। যা বলার আছে বলুন, আপনার বক্তব্য শোনা হবে। যা চাওয়ার আছে প্রার্থনা করুন, আপনাকে তাই দেওয়া হবে। যা সুপারিশ করার আছে করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আমি নিবেদন করব, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে তাদের সবার বেলায় (শাফাআতের) অনুমতি প্রদান করুন, যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তখন উত্তর দিবেন ঃ এটা আপনার কাজ নয়। তবে আমার মর্যাদা, আমার প্রতাপ ও আমার মাহাত্মের কসম! আমি নিজে জাহান্নাম থেকে এমন সবাইকে বের করে নিয়ে আসব, যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছিল। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যার দাবী রাখে ঃ

(১) হাদীসে যে যবের দানা পরিমাণ, সরিষার দানা পরিমাণ এবং সরিষার দানার চাইতেও স্বল্প পরিমাণ ঈমানের কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা ঈমানের নূর ও ঈমানের ফলাফলের বিশেষ বিশেষ স্তর ও পর্যায় উদ্দেশ্য। এগুলো আমরা ধরতে না পারলেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূক্ষ্ম দৃষ্টি সেদিন এ পর্যায়গুলোও ধরে নিতে পারবে এবং তিনি আল্লাহ্র হুকুমে এ স্তরের লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন।

(২) হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতের জন্য তিনবার শাফাআত করার পর চতুর্থবার আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবেদন করবেন যে, আমাকে ঐসব লোকদের বেলায়ও শাফাআতের অনুমতি দান করুন, যারা দুনিয়ার জীবনে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করেছে। কথাটির মর্ম বাহ্যতঃ এই যে, যে সব লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে ঈমান আনলেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্য যে সকল আমল করা উচিত ছিল, তারা সেগুলো মোটেও করেনি। এ ধরনের লোকদেরকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবেন। (বুখারী ও মুসলিমেই হযরত আবূ সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীসে সম্ভবতঃ এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কোন প্রকার নেক আমলই করে আসেনি।) আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেন যে, এ কাজ (অর্থাৎ, এ আমলশূন্যদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার কাজ) আপনার জন্য রাখিনি। অথবা মর্ম এই যে, এ কাজ আপনার জন্য শোভনীয় ও উচিত নয়; বরং এ কাজ আমার মর্যাদা ও আমার প্রতাপ এবং মাহাত্ম্যের জন্যই শোভনীয়। কেননা, আমার শান হচ্ছে এই যে, আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। তাই একাজটি আমি নিজে করব।

এ অধম সংকলকের দৃষ্টিতে এর মর্ম এই যে, যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু আল্লাহ্র বিধি-বিধান মোটেই পালন করেনি, এমন লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা পয়গাম্বরদের জন্য উচিত নয়, এ পর্যায়ের ক্ষমা ও দয়া কেবল আল্লাহ্র জন্যই শোভা পায়।

(৩) মনে হয়, এ রেওয়ায়াত ও বর্ণনা কিছুটা সংক্ষেপ করা হয়েছে। যেমন, এ হাদীসেরই বুখারী ও মুসলিমেরই অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হাশরের অধিবাসীরা হযরত আদম (আঃ)-এর পর এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পূর্বে হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছেও শাফাআতের জন্য হাজির হবে, যা এই রেওয়ায়তে নেই।

তাছাড়া এ হাদীসে কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আপন উম্মতের শাফাআতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অথচ যুক্তিযুক্ত বিষয় এটাই যে, তিনি প্রথমে সকল হাশরবাসীর জন্যই হিসাব ও বিচার অনুষ্ঠানের সুপারিশ করবেন, যাকে 'শাফাআতে কুবরা' বলা হয়। তারপর যখন হিসাব-নিকাশের ফলে নিজের উম্মতের অনেককেই নিজেদের গুনাহের কারণে জাহান্নামের দিকে পাঠানো হবে, তখন তিনি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে দাখিল করার জন্য সুপারিশ করবেন।

(৪) হাশরের অধিবাসীদের প্রতিনিধিরা যখন কোন সুপারিশকারীর সন্ধানে বের হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দেবেন যে, তারা যেন প্রথমে আদম (আঃ)-এর কাছে এবং পরে তাঁরই নির্দেশ ও পরামর্শে হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে এবং তারপর

ক্রমপর্যায়ে ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)-এর কাছে যায়। সে দিন এ সবকিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ জন্য হবে, যাতে সবাই বাস্তবে দেখে নেয় যে, এ শাফাআতের গুরুদায়িত্ব ও সর্বোচ্চ মর্যাদা আল্লাহ্‌র শেষ নবীর জন্যই নির্ধারিত।

যাহোক সেদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সবকিছুই করা হবে হাশরবাসীর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য।

(١١٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنْ اُمَّتِىْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِىْ يُسَمُّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ * (رواه البخارى)

১১০। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের এক দল মানুষকে আমার শাফাআত দ্বারা জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে, যাদেরকে 'জাহান্নামের অধিবাসী' বলে ডাকা হবে। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ নাম তাদের অপমান অথবা তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য হবে না। জাহান্নাম থেকে বের করে আনার কারণে তাদের এ নাম হয়ে যাবে। আর এটা তাদের জন্য খুশী ও আনন্দের কারণ হবে। কেননা, এ নাম তাদেরকে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

(١١١) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّىْ فَخَيَّرَنِىْ بَيْنَ اَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ اُمَّتِىْ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِىَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا * (رواه الترمذى وابن ماجة)

১১১। হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার কাছে এ পয়গাম নিয়ে আসল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়েছেন। হয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের অর্ধেক মানুষকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন অথবা আমাকে শাফা'আতের সুযোগ দেওয়া হবে। আমি তখন শাফাআতের অধিকারকেই গ্রহণ করে নিলাম। আর আমার এ শাফা'আত ঐসব মানুষের জন্য হবে, যারা (ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করে) এ অবস্থায় মারা গিয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করত না। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

(١١٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهٖ اَوْ نَفْسِهٖ * (رواه البخارى)

১১২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আমার শাফা'আত দ্বারা তারাই উপকৃত হবে, যারা আন্তরিকভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছিল। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মর্মও তাই, যা উপরের হাদীসে অন্য শব্দমালায় বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শিরকের ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকবে, শাফা'আত দ্বারা তার কোন উপকার হবে না। হ্যাঁ, কেউ যদি শিরক থেকে পবিত্র থাকে, তাহলে অন্যান্য গুনাহ্ থাকলেও সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত দ্বারা উপকৃত হবে।

(١١٣) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ * (رواه الترمذى وابوداؤد ورواه ابن ماجة عن جابر)

১১৩। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার শাফাআত হবে আমার উম্মতের ঐসব লোকদের বেলায়, যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। —তিরমিযী, আবু দাঊদ

ইমাম ইবনে মাজাহ্ এ হাদীসটি হযরত আনাসের স্থলে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ ধরনের হাদীস দেখে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে গুনাহ করার উপর আরো দুঃসাহসী হয়ে যাওয়া খুবই জঘন্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, যারা দুর্ভাগ্যক্রমে গুনাহ্ করে ফেলেছে তারাও যেন নিরাশ না হয়, আমি তাদের জন্য শাফা'আত করব। তাই তারা যেন শাফা'আত লাভের অধিকারী হওয়ার জন্য আল্লাহ্র সাথে তাদের বন্দেগী-সম্পর্ক এবং আমার সাথে উম্মত হওয়ার সম্পর্কটি ঠিক করে নেয়ার চেষ্টা করে।

(١١٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَقَالَ عِيْسٰى اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ وَبَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاجِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ ــ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ ــ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَسَاَلَهٗ فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ فَقَالَ اللّٰهُ لِجِبْرَئِيْلَ اذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ * (رواه مسلم)

১১৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বক্তব্য সম্বলিত কুরআন পাকের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! এ প্রতিমাগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। (অর্থাৎ, এদের কারণে অনেক লোক পথহারা হয়ে গিয়েছে।) অতএব, যারা আমার অনুসরণ করেছে, তারাই আমার। (তাই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আমি প্রার্থনা জানাই।) আর তিনি ঈসা (আঃ)-এর বক্তব্য সম্বলিত এ আয়াতটিও তেলাওয়াত করলেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমার উম্মতের এসব লোকদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে এরা তো তোমারই বান্দা। (অর্থাৎ, আযাব ও শাস্তি দেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার রয়েছে।)

এ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত তুলে দো'আ করলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমার উম্মত! আমার উম্মত!! এ বলে তিনি খুব কাঁদলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বললেন ঃ তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যাও। তোমার প্রতিপালক যদিও সবকিছু জানেন তবুও তুমি তাঁর কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি কেন কাঁদছেন ? নির্দেশমত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে ঐ কথাই বললেন, যা পূর্বে আল্লাহ্র কাছে নিবেদন করেছিলেন। (অর্থাৎ, এ মুহূর্তে আমার কান্নার কারণ হচ্ছে উম্মতের চিন্তা।) আল্লাহ্ তা'আলা তখন জিবরাঈলকে বললেন ঃ আবার তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে বলে দাও যে, আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে খুশী করে দেব এবং কোন দুশ্চিন্তায় ফেলে রাখব না। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির সারবস্তু এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কুরআন মজীদের দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। একটি হচ্ছে সূরা ইবরাহীমের আয়াত, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের উম্মত সম্পর্কে নিবেদন করছিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা আমার কথা মেনেছে তারা তো আমারই। (তাই তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে প্রার্থনা জানাই।) আর যারা আমার অবাধ্যতা করেছে (তাদেরকেও আপনি ক্ষমা করে দিতে পারেন।) কেননা, আপনি খুবই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

দ্বিতীয় আয়াতটি ছিল সূরা মায়েদার। সেখানে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের পথভ্রষ্ট উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে আবেদন করবেন যে, আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহলে এরা তো আপনারই বান্দা। তাই শাস্তি দেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার রয়েছে। আর আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি তো পরাক্রান্ত, (যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।) এবং সুবিজ্ঞ, (অর্থাৎ, যা করবেন তা হেকমত অনুযায়ীই হবে।) এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্র দুই মহান পয়গাম্বর পূর্ণ আদব রক্ষা করে এবং সতর্কতার সাথে নিজ নিজ উম্মতের গুনাহগারদের জন্য খুবই নরম ভাষায় সুপারিশ করেছেন।

এ আয়াতগুলোর তেলাওয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ উম্মতের বিষয়ে আরও বেশী ভাবিয়ে তুলল এবং তিনি হাত তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে নিজের চিন্তার কথাটি আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, আপনার উম্মতের বিষয়টি আপনার ইচ্ছা ও খুশী অনুযায়ীই মীমাংসা করা হবে। এ কারণে আপনাকে দুঃখিত ও চিন্তিত হতে হবে না।

এটা এক বাস্তব সত্য যে, প্রত্যেক নবীরই তাঁর উম্মতের প্রতি; বরং বলতে হয় যে, প্রত্যেক নেতারই তার অনুসারীদের প্রতি একটা বিশেষ ধরনের স্নেহের সম্পর্ক থাকে। যেমন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার সন্তানদের সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক থাকে, যা অন্যদের সাথে হয় না। এ সম্পর্কের কারণে তাদের আন্তরিক বাসনা এ থাকে যে, এরা যেন আল্লাহ্র আযাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়। এ স্নেহ ভালবাসায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল পয়গম্বরদের চেয়ে অগ্রগামী। এ জন্য স্বভাবগতভাবেই তাঁর বাসনা ছিল যে, তাঁর উম্মত যেন

জাহান্নামে না যায়। আর যাদের গুনাহ্ এ পর্যায়ের যে, তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং কিছু শাস্তি পাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, তাদেরকেও যেন কিছু শাস্তি পাওয়ার পর জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়। এসব হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন এবং তাঁর শাফা'আত দ্বারা অনেক মানুষ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর অনেককেই সেখানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর বের করে নিয়ে আসা হবে।

শাফা'আত সংক্রান্ত হাদীসসমূহের মধ্যে মুসলিম শরীফের এ হাদীসটি আমাদের ন্যায় অপরাধী ও গুনাহ্গারদের জন্য আশার আলো। এতে রয়েছে বিরাট সুসংবাদ।

কোন কোন রেওয়ায়তে একথাও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্র বার্তা শুনে বলেছিলেন ঃ আমি তো তখনই খুশী ও পরিতৃপ্ত হব, যখন আমার কোন উম্মতই জাহান্নামে থাকবে না। আহা! কত বড় আশা ও সুসংবাদের কথা! এমন মমতাময় নবীর উপর আমাদের জীবন উৎসর্গ হোক।

জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন। এতদসত্ত্বেও তিনি যে জিবরাঈল (আঃ)কে পাঠিয়ে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কেবল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য ছিল।

(١١٥) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثَلٰثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ * (رواه ابن ماجة)

১১৫। হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন তিন ধরনের মানুষ (বিশেষভাবে) শাফা'আত করবেন। নবী-রাসূলগণ, তারপর আলেমগণ, তারপর শহীদগণ। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এ নয় যে, এ তিন দলের বাইরের কেউ কারো জন্য শাফা'আত করবে না; বরং এর অর্থ এই যে, বিশেষ শাফা'আত এ তিন দলের লোকেরাই করবে। তবে তাদের বাইরেও অনেক পুণ্যবান ব্যক্তি শাফা'আতের অনুমতি লাভ করবে, যারা এ তিন দলের মধ্যে কোন দলেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নাবালেগ শিশুরাও তাদের পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। অনুরূপভাবে নেক আমলও আমলকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।

(١١٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ * (رواه الترمذى)

১১৬। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের কিছু লোক এমন হবে, যারা একটি দল ও একটি কওমের জন্য শাফা'আত করবে। (অর্থাৎ, তাদের মর্যাদা এমন হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা

তাদেরকে একটি কওমের ব্যাপারে শাফা'আতের অনুমতি দিয়ে দেবেন এবং এ সুপারিশ গ্রহণও করে নেবেন।) আর কিছু লোক এমন হবে, যারা দশ থেকে চল্লিশ জনের একটি জামাআতের জন্য শাফা'আত করবে এবং কিছুলোক এমন হবে যে, তারা একজন মানুষের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। এভাবে সবাই জান্নাতে পৌঁছে যাবে। —তিরমিযী

(١١٧) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفُّ اَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّبِهِمْ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلاَنُ اَمَا تَعْرِفُنِيْ اَنَا الَّذِيْ سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا الَّذِيْ وَهَبْتُ لَكَ وَضُوْءً فَيَشْفَعُ لَهٗ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ * (رواه ابن ماجة)

১১৭। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদেরকে কাতারবন্দী করে দাঁড় করানো হবে। (অর্থাৎ, মু'মিনদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক গুনাহ্গার লোককে যারা নিজেদের অপরাধের দরুন জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যাবে, আখেরাতে তাদেরকে কোন এক স্থানে সমবেত করা হবে।) এ সময় জান্নাতীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে যাবে। তখন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাকে ডাক দিয়ে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না ? আমি তো সে ব্যক্তি, যে একদিন তোমাকে পানি পান করিয়েছিলাম। আরেকজন বলবে, আমি তো দুনিয়াতে তোমাকে ওযূর পানি দিয়েছিলাম। এই জান্নাতী ব্যক্তি তখন তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, দুনিয়াতে পুণ্যবান লোকদের সাথে ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা থাকলে নিজের আমলের ত্রুটি থাকলেও ইন্শাআল্লাহ্ এটা বিরাট কাজে আসবে। তবে শর্ত হল, ঈমান থাকতে হবে।

বড়ই আক্ষেপের কথা যে, এ বিষয়ে অনেক মূর্খ লোক মারাত্মক ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। অপর দিকে এ যুগের অনেক লেখাপড়া জানা মানুষ এ বিষয়টির প্রতি সীমাহীন উদাসীনতা প্রদর্শন করে যাচ্ছে।

জান্নাত ও এর নেয়ামতসমূহ

পরকালীন জগতের যেসব বাস্তব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা একজন মু'মিনের জন্য একান্ত জরুরী এবং যেগুলোর উপর ঈমান না আনলে কোন ব্যক্তি মু'মিন ও মুসলমান হতে পারে না, এ বিষয়গুলোর মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামও অন্তর্ভুক্ত। আর এ দু'টি স্থানই হচ্ছে মানুষের শেষ ও চিরস্থায়ী ঠিকানা।

কুরআন মজীদে জান্নাত ও এর নেয়ামতের কথা এবং জাহান্নাম ও এর শাস্তি এবং কষ্টের কথা বিভিন্ন আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সবগুলো আয়াত যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে এগুলো দিয়েই একটি গ্রন্থ তৈরী হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে হাদীসের কিতাবসমূহে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচুর হাদীস সংরক্ষিত রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা এ দু'টি স্থান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও ধারণা পাওয়া যায়। এরপরও এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, কুরআন হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা

কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, এর প্রকৃত ও পরিপূর্ণ স্বরূপ কেবল সেখানে পৌঁছার পর এবং প্রত্যক্ষ করার পরই জানা যাবে। জান্নাত তো জান্নাতই। কোন ব্যক্তি যদি আমাদের এ পৃথিবীর কোন সুন্দর শহরের বাজার, সেখানকার বাগান ও পুষ্পকাননের কথা আমাদের সামনে আলোচনা করে, তাহলে তার বর্ণনা দ্বারা যে ধারণা আমাদের মস্তিষ্কে আসে অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তা সর্বদাই প্রকৃত অবস্থার চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। যাহোক, এ বাস্তব বিষয়টি সামনে রেখেই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনাগুলো পাঠ করা চাই।

প্রকৃতপক্ষে কুরআনের আয়াতে ও হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নামের যে আলোচনা করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, মানুষের সামনে সেখানকার ভৌগলিক পরিধি ও যাবতীয় অবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হবে; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মধ্যে জাহান্নামের আযাবের ভয় সৃষ্টি করা এবং যেসব মন্দকাজ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়, সেগুলো থেকে তাদের বিরত রাখা। জান্নাতের আলোচনার উদ্দেশ্যও এটাই যে, মানুষের অন্তরে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হোক, যাতে তারা এমন কাজ করে, যেগুলো মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায় এবং সেখানকার অফুরন্ত নেয়ামতের অধিকারী বানিয়ে দেয়। তাই এ ধারার আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রকৃত দাবী এই যে, এগুলো পাঠ ও শ্রবণ করে যেন জান্নাতের প্রতি অনুরাগ এবং জাহান্নামের ভয় অন্তরে জাগ্রত হয়।

(١١٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَ اقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ * (رواه البخارى ومسلم)

১১৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখে নাই, কোন কানও শুনে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে এর কল্পনাও আসে নাই। তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করে নাও ঃ "কেউ জানে না যে, তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি কি নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এটা হচ্ছে হাদীসে কুদসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা এভাবে উল্লেখ করেন যে, এটা আল্লাহ্র বাণী, (আর সেটা যদি কুরআনের আয়াত না হয়,) তাহলে এ ধরণের হাদীসকে 'হাদীসে কুদসী' বলে। এ হাদীসটিও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

এ হাদীসে আল্লাহ্র নেক বান্দাদের জন্য সুসংবাদ ও আনন্দের একটি সাধারণ ও বাহ্যিক দিক তো এ রয়েছে যে, আখেরাতে তারা এমন উন্নত ধরনের নেয়ামত লাভ করবে, যা দুনিয়ার কারো ভাগ্যে জুটে না; বরং এগুলো এমন নেয়ামত যে, কোন চোখ তা দেখে নাই, কোন কান এর অবস্থা শুনে নাই এবং কারো কল্পনায়ও এর ধারণা আসে নাই। সুসংবাদ ও আনন্দের আরেকটি বিশেষ দিক রয়েছে স্নেহ-ভালবাসা ও দয়া-অনুগ্রহে ভরা দয়াময় প্রভুর এ শব্দমালার মধ্যে 'আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি।' দয়াময় আল্লাহ্র এ অনুগ্রহের উপর বান্দাদের জীবন উৎসর্গ করে দেয়া উচিত।

(١١٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا * (رواه البخارى ومسلم)

১১৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের মধ্যে একটি চাবুকের জায়গা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যস্থিত সবকিছুর চেয়েও উত্তম। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আরববাসীর মধ্যে এ নিয়ম ছিল যে, কোন কাফেলা যাত্রা পথে যখন কোথায়ও সাময়িকভাবে অবস্থান করতে চাইত, তখন যাত্রীদের মধ্যে যে যেখানে নিজের চাবুকটি রেখে দিত, সে স্থানটুকু তার জন্যই নির্ধারিত মনে করা হত এবং অন্য কেউ সেখানে দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারত না। তাই এ হাদীসে 'চাবুকের জায়গা' দ্বারা এ সংক্ষিপ্ত স্থান ও পরিধিই উদ্দেশ্য, যা চাবুক ফেলে দিয়ে একজন মুসাফির নিজের দখলে নিয়ে থাকে, যেখানে সে নিজের বিছানা পেতে নেয় অথবা তাঁবু টানিয়ে নেয়। তাহলে হাদীসটির মর্ম এ হল যে, জান্নাতের অতি সামান্য জায়গাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যস্থিত সবকিছুর চাইতে উত্তম ও মূল্যবান।

(١٢٠) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَائَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا * (رواه البخارى)

১২০। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে সকালে অথবা সন্ধ্যায় 'একবার বের হওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সবকিছুর চাইতে উত্তম।' জান্নাতবাসীদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন একজন মহিলা যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি দিয়ে দেখে, তাহলে এ দু'টির মধ্যস্থিত স্থান (অর্থাৎ, জান্নাত থেকে এ ভূমন্ডল পর্যন্ত) আলোকিত হয়ে যাবে এবং সুঘ্রাণে ভরে যাবে। আর তার মাথার ছোট্ট চাদরটিও দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির শুরু অংশে আল্লাহ্‌র রাহে বের হওয়ার অর্থ দ্বীনের খেদমত সংক্রান্ত যে কোন কাজে সফর ও চলাফেরা করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকাল অথবা সন্ধ্যায় একবার এ উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়াও দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সকল কিছুর চাইতে উত্তম। এখানে সকাল ও সন্ধ্যার কথা সম্ভবতঃ এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতীতকালে এ দু'টি সময়েই সফরে যাত্রা করার প্রচলন ছিল। কেউ যদি দিনের মধ্যভাগে দ্বীনি খেদমতের জন্য ঘর থেকে বের হয়, তাহলে সেও অবশ্যই এ ফযীলত লাভ করবে।

হাদীসের দ্বিতীয় অংশে জান্নাতী লোকদের জান্নাতী স্ত্রীদের অসাধারণ রূপ-সৌন্দর্য এবং তাদের লেবাস-পোশাকের মান-মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ মু'মিনদেরকে দ্বীনি কাজের জন্য বাড়ী–ঘর ছেড়ে আল্লাহ্‌র রাহে বের হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং এ কথা বলে দেওয়া যে, তোমরা যদি নিজেদের গৃহ ও গৃহিনীদেরকে সাময়িকভাবে ছেড়ে দিয়ে সামান্য সময়ের জন্যও আল্লাহ্‌র রাহে বের হয়ে যাও,

তাহলে জান্নাতে এমন স্ত্রীগণ তোমাদের চিরদিনের জন্য জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকবে, যাদের রূপ-সৌন্দর্যের অবস্থা হচ্ছে, তাদের কেউ যদি এ দুনিয়ার দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে, তাহলে আসমান-যমীনের মধ্যকার সারা পরিবেশ আলোকিত ও আমোদিত হয়ে যাবে। আর তাদের লেবাস-পোশাক এমন মূল্যবান যে, কেবল মাথার ছোট্ট চাদরটি দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম।

(١٢١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَلَقَابَ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ * (رواه البخارى و مسلم)

১২১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, একজন আরোহী একশ বছর এর ছায়ায় চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। আর জান্নাতে তোমাদের কারো ধনুক পরিমাণ জায়গাও এ জগতের সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম, যার উপর সূর্য উদিত হয় অথবা অস্তমিত হয়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির উদ্দেশ্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার সুখ ও আরাম আনন্দের তুলনায় জান্নাত ও এর নেয়ামতসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে মানুষের অন্তরে এর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তোলা। এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা এ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের আরাম ও শান্তির জন্য যেসব নেয়ামত সৃষ্টি করে রেখেছেন, এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে জান্নাতের ঐ প্রকান্ড বৃক্ষসমূহ, যেগুলোর ছায়া এত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে হবে যে, একজন আরোহী একশ' বছরেও তা অতিক্রম করতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, জান্নাতের একটি ধনুক পরিমাণ জায়গাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যস্থিত সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম। একটু পূর্বেই আরবদের এ রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মুসাফির যখন কোন জায়গায় অবতরণ করতে চাইত, তখন সে স্থানে নিজের চাবুক ফেলে দিত। আর এভাবে সে জায়গায় তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। ঠিক এরূপ আরেকটি রীতিও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, কোন পথচারী যখন কোন স্থানে অবতরণ করতে চাইত, তখন সে সেখানে নিজের ধনুকটি রেখে দিত এবং এভাবে সে স্থানটি তার জন্য নির্ধারিত হয়ে যেত। তাই এ হাদীসে উল্লেখিত 'ধনুকের জায়গা' দ্বারা একজন মানুষের অবতরণস্থল উদ্দেশ্য। তাই কথাটির মর্ম এই হল যে, একজন পথচারী মুসাফির নিজের ধনুক নিক্ষেপ করে যতটুকু জায়গায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে, জান্নাতের এতটুকু সামান্য জায়গাও এ পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের চেয়ে মূল্যবান ও উত্তম, যার উপর সূর্যের আলো পড়ে।

(١٢٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ * (رواه مسلم)

১২২। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে খাদ্য গ্রহণ করবে, পানীয় পান করবে; কিন্তু তাদের থুথু আসবে না, পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক দিয়ে শ্লেষ্মাও আসবে না। সাহাবীগণ আরয করলেন, তাহলে তাদের খাবারগুলো কি হবে (অর্থাৎ, পেশাব-পায়খানা কিছুই যখন হবে না, তাহলে যা কিছু খাওয়া হবে তা কোথায় যাবে ?) তিনি উত্তর দিলেন ঃ ঢেকুর এবং মেশকের মত সুগন্ধযুক্ত ঘাম (দ্বারা খাবারের বর্জনীয় প্রভাব বের হয়ে যাবে।) আর জান্নাতীদের মুখে আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা এভাবে চলতে থাকবে, যেভাবে তোমাদের নিঃশ্বাস চলতে থাকে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, জান্নাতের প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য ঘন পদার্থ থেকে পবিত্র এবং এমন সূক্ষ্ম ও কোমল হবে যে, কোন প্রকার মলমূত্র তৈরীই হবে না। একটি সুস্বাদু ঢেকুর আসলেই পেট খালি হয়ে যাবে, আর কিছু অংশ ঘামের সাথে বেরিয়ে যাবে। তবে এ ঘামের মধ্যেও মেশকের মত সুগন্ধ থাকবে।

এ দুনিয়াতে যেভাবে আমাদের ভিতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভিতরে আপনা আপনিই শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে, জান্নাতে এভাবেই আল্লাহ্র যিকর তথা সুবহানাল্লাহ্, আলহামদু লিল্লাহ্ প্রতিটি জান্নাতীর মুখে শ্বাস-নিঃশ্বাসের মতই জারী থাকবে।

(١٢٣) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلاَ تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُوْا فَلاَ تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْاَسُوْا اَبَدًا * (رواه مسلم)

১২৩। হযরত আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ এখানে নিরাময়ই তোমাদের অর্জন এবং সুস্থতাই তোমাদের জন্য সাব্যস্ত, তাই তোমরা কখনো অসুস্থ হবে না। এখানে তোমাদের জন্য জীবনই জীবন, অতএব, আর কখনোও তোমাদের মৃত্যু হবে না, এখানে তোমাদের জন্য কেবল যৌবন ও তারুণ্য, তোমাদের আর কখনও বার্ধক্য আসবে না এবং তোমাদের জন্য এখানে আনন্দই আনন্দ এখন আর কখনো কোন প্রকার সংকট ও সমস্যা তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ জান্নাত শান্তি-সুখের আবাস। তাই সেখানে কোন কষ্ট ও কষ্টকর অবস্থার অস্তিত্বই থাকবে না। সেখানে অসুস্থতা থাকবে না, মৃত্যু আসবে না। সেখানে বার্ধক্যও কাউকে পীড়া দেবে না এবং কোন প্রকার কষ্ট ও অভাব কাউকে স্পর্শ করবে না। জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে পৌঁছবে, তখন শুরুতেই তাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী জীবন ও চিরসুখের এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করে দেয়া হবে।

(١٢٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّا خُلِقَ الْخَلْقُ ؟ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْنَا اَلْجَنَّةُ مَابِنَاءُ هَا قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الاَذْفَرُ وَحَصْبَاءُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ وَ

تُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَّدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَايَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلاَ يَمُوْتُ وَلاَ يَبْلٰى ثِيَابُهُمْ وَلاَ يَفْنٰى شَبَابُهُمْ *

(رواه احمد والترمذى والدارمى)

১২৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, সৃষ্টিকুলকে কোন্ জিনিস দ্বারা পয়দা করা হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, পানি দ্বারা। আমরা আবার জিজ্ঞাসা করলাম, জান্নাত কিসের দ্বারা তৈরী করা হয়েছে? (অর্থাৎ, এর নির্মাণ কি পাথর দ্বারা হয়েছে, না ইট দিয়ে না অন্য কোন জিনিস দিয়ে?) তিনি উত্তরে বললেন ঃ এর নির্মাণ কাজ এরূপ যে, একটি ইট সোনার, আরেকটি ইট রূপার, আর এর গাঁথুনি হচ্ছে কড়া সুগন্ধিযুক্ত মেশকের। সেখানে বিছানো পাথরদানাগুলো হচ্ছে ইয়াকুত এবং মোতি, আর মাটি হচ্ছে জাফরান। যারা এ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা চিরকাল সুখে ও আনন্দে থাকবে, কোন কষ্টের সম্মুখীন হবে না। তারা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, তাদের মৃত্যু আসবে না। তাদের পোশাক কখনো পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না। —আহ্মাদ, তিরমিযী, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ)-এর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, সাধারণ সৃষ্টিকে পানি দ্বারা সৃজন করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম পানি সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর এ পানি থেকেই অন্যান্য মাখলূক অস্তিত্বে এসেছে। কুরআন পাকেও বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।" অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ "আমি প্রাণবন্ত সবকিছুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" এর সারমর্ম এই যে, সকল প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জান্নাতের নির্মাণ, সেখানকার ফরশ এবং মাটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকিছু বলেছেন, এর প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থা চাক্ষুষ দেখার মাধ্যমেই বুঝা যাবে। তবে এ কথাটি মনে রাখা চাই যে, জান্নাতের নির্মাণ এভাবে হয়নি, যেভাবে এই দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রাসাদ তৈরী করা হয়ে থাকে; বরং জান্নাত এবং জান্নাতের প্রতিটি বস্তু কোন স্থপতি ও রাজ-মিস্ত্রির মাধ্যম ছাড়াই কেবল আল্লাহ্র হুকুমে তৈরী হয়েছে। যেমন যমীন, আসমান, আসমানের তারাকারাজি, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সবকিছুই সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশে তৈরী হয়েছে। আল্লাহ্র শান হচ্ছে এই যে, তিনি যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, হয়ে যাও, আর তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্র স্থায়ী সন্তোষের ঘোষণা

(١٢٥) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضٰى يَا رَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلاَ اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ ؟ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا * (رواه البخارى ومسلم)

১২৫। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (জান্নাতীরা যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবে এবং সেখানকার সকল নেয়ামত পেয়ে যাবে, তখন) আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসী! তখন তারা উত্তরে বলবে, হে আমাদের রব! আমরা হাজির, আমরা আপনার পবিত্র দরবারে হাজির। সকল কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি খুশী আছ? (অর্থাৎ, জান্নাত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ লাভ করে তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?) জান্নাতী বান্দারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা কেন খুশী থাকব না, অথচ আপনি আমাদেরকে এমন এমন নেয়ামত দান করেছেন, যা আপনার কোন সৃষ্টিকেই দান করেননি। (অর্থাৎ, আপনার দয়া ও অনুগ্রহে এখানে যখন আমরা ঐসব নেয়ামত লাভ করেছি, যা দুনিয়াতে কেউ পায়নি, তাই আমরা কেন খুশী থাকব না?) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এগুলোর চাইতে বহুগুণ উত্তম আরেকটি জিনিস দান করব না? তারা বলবে, এর চেয়ে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেন ঃ আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টির ঘোষণা শুনিয়ে দিচ্ছি। অতএব, আমি এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ জান্নাত এবং এর সব ধরনের নেয়ামত দান করার পর দয়াময় আল্লাহ্ যে, বান্দাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি খুশী হয়েছ? স্বয়ং এটাই তো এক বিরাট নেয়ামত। তারপর স্থায়ী সন্তুষ্টির উপঢৌকন এবং কখনো অসন্তুষ্ট না হওয়ার ঘোষণা প্রদান কত বড় দয়া ও অনুগ্রহ! এর দ্বারা জান্নাতীদের মনে যে শান্তি ও আনন্দ আসবে, এর অণু পরিমাণও যদি এ জগতে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তাহলে দুনিয়ার কোন সুখ ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষাই আর আমাদের অন্তরে স্থান পাবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি জান্নাত এবং জান্নাতের সকল নেয়ামতের চাইতে উত্তম এবং বহু ঊর্ধ্বের বিষয়। আল্লাহ্র সামান্য সন্তুষ্টিও বিরাট দৌলত। সন্তুষ্টি ঘোষণার আনন্দ ও সুখের চাইতে বেশী আনন্দের বিষয় একটাই আছে। আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ্র দীদার বা দর্শন লাভ করা।

জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার

মহান আল্লাহ্র দীদার হচ্ছে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এ নেয়ামত দ্বারা জান্নাতীদেরকে ভূষিত করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে সঠিক জ্ঞান ও সুস্থ বিবেক দান করেছেন, তারা যদি নিজেদের অনুভূতি নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে এ নেয়ামতের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই নিজেদের মধ্যে খুঁজে পাবে। কেননা, যে বন্দা নিজের সৃষ্টিকর্তা ও মহান প্রভুর অসংখ্য নেয়ামতরাজি এ দুনিয়ায় ভোগ করে যাচ্ছে এবং জান্নাতে গিয়ে এর চাইতে লক্ষগুণ বেশী নেয়ামত পাবে, তার অন্তরে অবশ্যই এই বাসনা জাগ্রত হবে যে, হায়! আমি যদি কোনভাবে আমার পরম দয়ালু ও অনুগ্রহশীল প্রভুকে দেখতে পেতাম, যিনি আমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং এভাবে আমাকে দু'হাতে আপন নেয়ামতসমূহ বিলিয়ে দিচ্ছেন। তাই সে যদি কখনো আল্লাহ্র দীদার না পায়, তাহলে তার খুশী ও আনন্দে এবং তার পারলৌকিক জীবনে অবশ্যই এক বিরাট অপূর্ণতা থেকে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার প্রতি খুশী হয়ে তাকে জান্নাত দান করবেন, তাকে কখনো দীদারের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখবেন না।

ঈমানদারদের জন্য কুরআন মজীদেও এই বিরাট নেয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে স্পষ্টভাবে এর সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়েছেন এবং সকল ঈমানদাররা কোন প্রকার সংশয় সন্দেহ ছাড়া এই বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। কিন্তু কোন কোন মহল এবং এমন কিছু লোক যারা আখেরাতের বিষয়গুলোকেও এ দুনিয়ার মাপে চিন্তা করে এবং নিজেদের সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত পর্যায় বলে মনে করে, তাদের মধ্যে এ বিষয়টিতে দ্বিধা ও সংশয় দেখা যায়। তারা চিন্তা করে যে, দেখা যায় তো কেবল ঐ জিনিসকে, যার দেহ আছে, যার রং আছে এবং যা চোখের সামনে থাকে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা দেহমুক্ত, তার কোন রংও নেই, তাঁর সামনে অথবা পেছনে বলতে কোন দিক নেই। তাই তাঁকে কিভাবে দেখা সম্ভব হবে ? আসলে এটা একটা বিভ্রান্তি। হকপন্থীদের আকীদা-বিশ্বাস যদি এই হত যে, আল্লাহ্ তা'আলার দীদার ও দর্শন দুনিয়ার এই চোখ দিয়েই হবে, যা কেবল দেহকে এবং কোন বর্ণধারী জিনিসকেই দেখতে পারে এবং যার দৃষ্টিশক্তি কেবল নিজের সামনে অবস্থিত জিনিসকেই ধরতে পারে, তাহলে আল্লাহ্র দীদার অস্বীকারকারীদের এ চিন্তা কিছুটা সঠিক বলে মেনে নেয়া যেত। কিন্তু কুরআন-হাদীসও এ কথা বলেনি এবং হকপন্থীদের আকীদাও এটা নয়।

হকপন্থী লোকগণ তথা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত–যারা কুরআন হাদীসের অনুসরণে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ্র দীদার ঐসব বান্দারা লাভ করবে, যারা জান্নাতে যাবে, তারা এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে এমন এমন শক্তিও দান করবেন, যা এ দুনিয়াতে কাউকে দেয়া হয়নি। এইগুলোর মধ্যে একটি ইহাও যে, তাদেরকে এমন চোখ দান করা হবে, যার দৃষ্টিশক্তি সীমিত ও দুর্বল হবে না, যা এ দুনিয়াতে আমাদের চোখের হয়ে থাকে। জান্নাতীরা ঐ জান্নাতী চোখ দিয়েই মহান আল্লাহ্র দীদার ও দর্শন লাভ করবে, যাঁর কোন দেহ নেই, কোন রং বা বর্ণ নেই, যার জন্য কোন দিক নেই। তিনি এসবের ঊর্ধ্বে এবং তিনি কেমন তা কেবল তিনি নিজেই জানেন।

এই স্পষ্ট আলোচনার পরও আল্লাহ্র দীদার সম্পর্কে যাদের অন্তরে খট্কা থেকে যায় যে, জ্ঞানগত দিক দিয়ে এটা অসম্ভব, তারা যেন সামান্য সময়ের জন্য এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাখলূককে দেখেন কি না ? দর্শন যদি কেবল ঐসব মাধ্যম এবং ঐসব শর্তসাপেক্ষে হয়, যেগুলো দিয়ে আমরা দেখি, তাহলে তো আল্লাহ্ তা'আলারও দেখতে না পারারই কথা। কেননা, আল্লাহ্র চোখ নেই এবং তাঁর তুলনায় কোন মাখলুক ডান বাম ইত্যাদি কোন দিকের মধ্যে নেই। অতএব, যারা এ কথায় ঈমান রাখে যে, আল্লাহ্ তা'আলা চোখ ছাড়া দেখতে পারেন, এমনকি আমাদের চোখ যা দেখতে পারে না, তিনি তাও দেখতে পারেন এবং সম্মুখে না থাকলেও দেখতে পারেন, তাদের মনে আল্লাহ্র দীদার সম্পর্কেও কোন প্রশ্ন আসা উচিত নয়; বরং আল্লাহ্ ও রাসূলের সংবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে একথা মেনে নেয়া উচিত যে, আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরত ও অনুগ্রহে জান্নাতী বান্দাদের এমন চোখ দান করবেন, যে চোখ মহান আল্লাহ্র দীদারের স্বাদও লাভ করতে পারবে।

কুরআন পাকে ঈমানদারকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, "জান্নাতীদের মুখমন্ডল সেদিন উজ্জ্বল থাকবে এবং তারা তাদের পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।" এর বিপরীত অন্যত্র মিথ্যা

প্রতিপন্নকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "তারা সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।" (অর্থাৎ, তাঁর সাক্ষাত ও দীদার থেকে বঞ্চিত থাকবে।) জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এগুলো সব মিলে 'মুতাওয়াতির' হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং একজন মু'মিনের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। নিম্নে এগুলো থেকে কেবল কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

(١٢٦) عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَ تُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، قَالَ فَيَرْفَعُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُوْنَ اِلٰى وَجْهِ اللّٰهِ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ اِلٰى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلاَ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ * (رواه مسلم)

১২৬। হযরত সুহাইব রুমী (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে আরেকটি বাড়তি জিনিস দান করি ? (অর্থাৎ, এ পর্যন্ত তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে এর উপর অতিরিক্ত আরেকটি বিশেষ জিনিস দান করি ?) তারা বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দেননি ? আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে জান্নাতে দাখিল করেননি ? (তাই এর উপর অতিরিক্ত আর কোন্ জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করব ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের এ উত্তরের পর হঠাৎ তাদের চোখ থেকে পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে। তাই তারা আল্লাহ্কে কোন পর্দার অন্তরায় ছাড়া দেখতে থাকবে। তখন তারা অনুভব করবে যে, এ পর্যন্ত তাদেরকে যেসব নেয়ামত দান করা হয়েছে, এ দীদারই হচ্ছে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নেয়ামত। তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ "যারা দুনিয়াতে সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম স্থান (অর্থাৎ জান্নাত) এবং এর উপর রয়েছে আরেকটি বাড়তি নেয়ামত (অর্থাৎ, মহান আল্লাহ্র দীদার।") —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত চোখ থেকে পর্দা উঠে যাওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহূর্তের মধ্যে তাদের চোখগুলোকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করবেন যে, এগুলো আল্লাহ্কে দর্শন করতে সক্ষম হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষে যে আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, এর দ্বারা তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, 'বাড়তি জিনিস' দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্র দীদার। কেননা, এটা হবে জান্নাত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহের বাইরে অতিরিক্ত অর্জন।

(١٢٧) عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ فَاِنْ اسْتَطَعْتُمْ

اَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا * (رواه البخارى ومسلم)

১২৭। জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এর মধ্যে তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, আর এটা ছিল পূর্ণিমার রাত। এরপর তিনি আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ নিশ্চয়, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে এভাবেই দেখতে পাবে, যেভাবে এই পূর্ণিমার চাঁদকে দেখছ। তাঁকে দেখতে গিয়ে তোমরা কোন প্রকার ভীড় ও সংশয়ের সম্মুখীন হবে না। অতএব, তোমরা যদি সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযের ব্যাপারে সচেতন ও বিজয়ী থাকতে পার, (অর্থাৎ, এই নামাযদ্বয়ের সময় দুনিয়ার কোন ব্যস্ততা এবং আরামপ্রিয়তা যদি তোমাদেরকে পরাজিত করে অন্যমনস্ক করতে না পারে,) তাহলে অবশ্যই এমনটি করে যাও। (এর ফলে ইনশাআল্লাহ্ তোমরা আল্লাহ্র দীদারের সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ "নিজের প্রতিপালকের সপ্রশংস তস্‌বীহ্ পাঠ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে।" —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়াতে যখন কোন সুন্দর ও আকর্ষণীয় জিনিস দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়ে যায় এবং সবাই তা দেখার জন্য চরম উৎসুক হয়ে থাকে, তখন এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খুব ভীড় ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায় এবং ঐ জিনিসটি ভালভাবে দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু চাঁদের ব্যাপারটি এর ব্যতিক্রম। কেননা, এটা পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ কোন ভীড় ও ঠেলাঠেলি ছাড়াই পূর্ণ স্বস্তির সাথে একই সময়ে দেখতে পায়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার এভাবে একই সময়ে আল্লাহ্র অগণিত ভাগ্যবান বান্দারা লাভ করতে পারবে, এতে তাদেরকে কোন প্রকার ভীড় ও ঠেলাঠেলির সম্মুখীন হতে হবে না। সবার চোখ তখন অত্যন্ত শান্তভাবে এবং কোনরূপ ব্যাকুলতা ছাড়াই আল্লাহ্র দর্শনের স্বাদ লাভ করবে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এ দলের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

হাদীসটির শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি আমলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে এ নেয়ামত তথা দীদারে এলাহীর অধিকারী করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সেটা হচ্ছে ফজর ও আসরের নামাযের প্রতি এমন যত্নবান হওয়া যে, কোন ব্যস্ততা ও কোন চিত্তাকর্ষক বস্তু যেন এ নামাযের সময় বান্দাকে নিজের দিকে মনোযোগী করতে না পারে। ফরয নামায যদিও পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারাই জানা যায় যে, এ দু'টি নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত "তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস তসবীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে" পাঠ করে এ দু'টি নামাযের এ বৈশিষ্ট্য ও ফযীলতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

(١٢٨) عَنْ اَبِىْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكُلُّنَا يَرٰى رَبَّهٗ مُخْلِيًا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ وَمَا اٰيَةُ ذَالِكَ ؟ قَالَ يَا اَبَا رَزِيْنٍ اَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهٖ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَجَلُّ وَاَعْظَمُ * (رواه ابوداؤد)

১২৮। আবূ রযীন উকাইলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন আমরা সবাই কি ভীড়মুক্ত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পারব ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। আমি নিবেদন করলাম, দুনিয়াতে কি এর কোন দৃষ্টান্ত আছে ? তিনি বললেন ঃ হে আবূ রযীন! পূর্ণিমার রাতে কি তোমাদের সবাই ভীড়মুক্ত অবস্থার চাঁদ দেখতে পার না ? আমি আরয করলাম, হ্যাঁ। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ চাঁদ তো আল্লাহ্র এক নগণ্য সৃষ্টি, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সবচেয়ে মহান ও প্রতাপশালী। (তাই তাঁকে দেখতে গিয়ে কেন সমস্যা হবে ?) —আবূ দাউদ

জাহান্নাম ও এর শাস্তি

জান্নাত সম্পর্কে যেভাবে কুরআন পাকের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সেখানে এমন শান্তি, সুখ ও আরামের ব্যবস্থা থাকবে যে, দুনিয়ার যে কোন শান্তি সুখের এর সাথে তুলনাই হতে পারে না। তেমনিভাবে জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআন হাদীসে যা বর্ণনা করা হয়েছে, এতে জানা যায় যে, সেখানে এমন দুঃখ-কষ্ট থাকবে যে, দুনিয়ার যে কোন বিরাট দুঃখ ও কষ্টের সাথে এরও তুলনা হতে পারে না; বরং আসল বাস্তবতা এই যে, কুরআন ও হাদীসের শব্দমালা দ্বারা জান্নাতের সুখ এবং জাহান্নামের কষ্টের যে কল্পনা ও চিত্র আমাদের মস্তিষ্কে উদিত হয়, সেটাও আসল বাস্তবতার চেয়ে অনেক কম। আর এটা এজন্য যে, আমাদের ভাষার সকল শব্দমালা আমাদের এ দুনিয়ার বস্তুসমূহের জন্যই উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলো দিয়ে আখেরাতের জিনিসসমূহ বুঝানো সম্ভব নয়। যেমন, আপেল অথবা আঙ্গুর শব্দ বললে আমাদের চিন্তা কেবল সেই ধরনের আপেল ও আঙ্গুরের দিকে যেতে পারে, যেগুলো আমরা দেখেছি এবং খেয়েছি। আমরা জান্নাতের ঐ আপেল ও আঙ্গুরের প্রকৃত স্বরূপ ও ধরন কিভাবে কল্পনা করতে পারি, যা স্বাদ ও গুণে এখানকার আপেল ও আঙ্গুরের চাইতে হাজার গুণ উন্নত এবং যার কোন দৃষ্টান্ত আমরা দুনিয়াতে দেখি না।

অনুরূপভাবে সাপ-বিচ্ছু শব্দ বললে আমাদের চিন্তা ঐ ধরনের সাপ-বিচ্ছুর দিকেই যেতে পারে, যেগুলো আমরা এ দুনিয়ায় দেখে থাকি। জাহান্নামের ঐ সাপ-বিচ্ছুর চিত্র আমাদের চিন্তায় কিভাবে আসতে পারে, যেগুলো এখানকার সাপ-বিচ্ছুর তুলনায় হাজার গুণ বিরাটকায়, ভয়ঙ্কর ও বিষাক্ত এবং যেগুলো কল্পনায় আনাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহোক, কুরআন হাদীসের শব্দমালার দ্বারাও আমরা জান্নাত ও জাহান্নামের বস্তুসমূহের প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারব না। সেখানে গিয়েই আমরা জানতে পারব যে, জান্নাতের সুখ ও আরাম সম্পর্কে আমরা যা জেনেছিলাম ও বুঝেছিলাম, সেটা খুবই অসম্পূর্ণ ধারণা ছিল। জান্নাতে তো আমাদের ধারণার চাইতে হাজার গুণ বেশী শান্তি-সুখ রয়েছে। তেমনিভাবে জাহান্নামের দুঃখ ও

শাস্তি সম্পর্কে আমরা যা বুঝেছিলাম, বাস্তব অবস্থার তুলনায় সেটা খুবই কম ছিল। এখানে তো আমাদের ধারণার চাইতে হাজার গুণ বেশী দুঃখ-কষ্ট রয়েছে।

ইতোপূর্বে জান্নাতের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সেখানে যা কিছু ঘটবে সেটা আমরা এখানে বসে সম্পূর্ণ বুঝে নেব এবং সেখানকার অবস্থার বাস্তব চিত্র আমাদের চোখের সামনে এসে যাবে; বরং এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে ও জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে এমন জীবন যাপন করতে উৎসাহিত করা, যা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের পথে নিয়ে যাবে। আর এ উদ্দেশ্যের জন্য কুরআন ও হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে এতটুকুই যথেষ্ট। অতএব, এ ধারার আয়াত ও হাদীসের উপর চিন্তা করার সময় এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি আমাদের সামনে রাখতে হবে।

(١٢٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا * (رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى)

১২৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। সাহাবীদের পক্ষ থেকে বলা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ (দুনিয়ার) আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন ঃ জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের তুলনায় উনসত্তর মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিটি মাত্রার তাপ দুনিয়ার আগুনের তাপের সমান।

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ার আগুনের মধ্যেও দাহিকাশক্তি ও এর উত্তাপের বেলায় তারতম্য দেখা যায়। যেমন, লাকড়ীর আগুনের মধ্যে ঘাস-পাতার আগুনের চেয়ে বেশী উত্তাপ থাকে। আবার কয়লার আগুনের মধ্যে লাকড়ীর আগুনের চেয়ে বেশী উত্তাপ থাকে। কোন কোন বোমার দ্বারা সৃষ্ট আগুনে এসবগুলোর চেয়ে অনেক গুণ বেশী উত্তাপ ও শক্তি থাকে। বর্তমান যুগে তো যন্ত্রের সাহায্যে এটা জানাও সহজ হয়ে গিয়েছে যে, একটি আগুন অন্য আরেকটি আগুনের তুলনায় দাহন ক্ষমতায় কি পরিমাণ শক্তিশালী অথবা দুর্বল। তাই এখন আর এ হাদীসের বিষয়টি বুঝে নেয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয় যে, "জাহান্নামের আগুন এ দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী উত্তাপ নিজের মধ্যে ধারণ করে আছে।"

পূর্বেও কয়েকবার হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আরবী ভাষায় এসব ক্ষেত্রে সত্তর সংখ্যাটি কেবল কোন জিনিসের আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই হতে পারে যে, এ হাদীসেও এ সংখ্যাটি ঐ বাকরীতি অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসটির মর্ম এই হবে যে, জাহান্নামের আগুন তার দহনশক্তি ও উত্তাপের ক্ষেত্রে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী।

হাদীসটির শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জাহান্নামের আগুনের এ অবস্থাটি বর্ণনা করলেন, তখন জনৈক সাহাবী আরয করলেন যে, ইয়া

রাসূলাল্লাহ্! দুনিয়ার আগুনের উত্তাপই তো যথেষ্ট ছিল। এর উত্তরে তিনি আরো স্পষ্ট শব্দমালায় আগের বিষয়টিরই পুনরাবৃত্তি করলেন, এর বাইরে অন্য কোন উত্তর দিতে গেলেন না। এ ধারায় উত্তর দিয়ে সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে চেয়েছেন যে, আমাদেরকে আল্লাহ্র প্রতাপ ও আযাবকে ভয় করা চাই এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চিন্তা করা চাই। আমাদের জন্য আল্লাহ্র কার্যাবলী ও তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার ব্যাপারে এমন প্রশ্নের অবতারণা করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ্ যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু করবেন সেটাই সঠিক।

(١٣٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَ اِنَّهُ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا * (رواه البخارى ومسلم)

১৩০। নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির, যার পায়ে এক জোড়া আগুনের স্যান্ডেল ও ফিতা থাকবে। এগুলোর উত্তাপে তার মগজ এমনভাবে টগবগ করতে থাকবে, যেমন চুলোর উপর ডেকচি টগবগ করে। সে ধারণাও করবে না যে, অন্য কেউ তার চেয়ে অধিক শাস্তিতে জর্জরিত রয়েছে, (অর্থাৎ, সে নিজেকেই সবচেয়ে বেশী শাস্তিতে জর্জরিত মনে করবে,) অথচ সে হবে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত। —বুখারী, মুসলিম

(١٣١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ! وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّبِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ * (رواه مسلم)

১৩১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী ছিল। তারপর তাকে জাহান্নামের একটি চুবুনি দিয়ে উঠিয়ে আনা হবে। (অর্থাৎ, কাপড়ে রং দেয়ার সময় যেমন রংয়ের পাত্রে কাপড়টি ফেলে একটু চুবুনি দিয়ে তুলে ফেলা হয়, তেমনিভাবে এ লোকটিকে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তুলে নেয়া হবে।) তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনো কল্যাণ ও সুখ দেখেছ ? তোমার উপর দিয়ে কি কখনো শান্তি-সুখের দিন অতিবাহিত হয়েছে ? সে উত্তর দিবে, কখনও না, হে আল্লাহ্! তোমার কসম দিয়ে বলছি। জান্নাতীদের মধ্য থেকেও এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে কষ্টের জীবন কাটিয়েছিল। তাকেও

জান্নাতের একটি চুবুনি দিয়ে আনা হবে। (অর্থাৎ, জান্নাতের পরিবেশে ও এর বাতাসের মধ্যে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বের করে আনা হবে।) তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট দেখেছ ? তোমার উপর দিয়ে কি কখনো কঠিন সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ? সে বলবে, না হে আল্লাহ্! তোমার কসম দিয়ে বলছি যে, আমি কোন দুঃসময় দেখিনি এবং আমার উপর দিয়ে কখনো দুঃখ-কষ্ট যায়নি। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সারকথা এই যে, জাহান্নামের আযাব এত কঠিন যে, এর একটি মুহূর্ত সারা জীবনের সুখ-শান্তির কথা ভুলিয়ে দেবে। আর জান্নাতে ঐ শান্তি-সুখ রয়েছে যে, সেখানে পা রাখতেই মানুষ তার সারা জীবনের দুঃখ-কষ্ট একদম ভুলে যাবে।

(١٣٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى تَرْقُوَتِهِ * (رواه مسلم)

১৩২। সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের মধ্যে কিছু লোক এমন থাকবে, আগুন যাদের পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত স্পর্শ করবে, কিছুলোক এমন থাকবে যে, আগুন তাদের হাঁটু পর্যন্ত স্পর্শ করবে, কিছু লোক এমন থাকবে যে, আগুন তাদের কোমর পর্যন্ত স্পর্শ করবে, আর কিছুলোক এমন থাকবে যে, আগুন তাদের গলা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামে সবাই একই স্তরে এবং একই অবস্থার মধ্যে থাকবে না; বরং অপরাধের ধরন বিবেচনায় তাদের শাস্তির মধ্যে কমবেশী হবে। যেমন, কিছু লোকের অবস্থা এই হবে যে, আগুন কেবল তাদের পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে। কিছু লোকের শাস্তি এর চেয়ে বেশী হবে এবং আগুন তাদের হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আবার কিছু লোকের শাস্তি এর চেয়েও বেশী হবে এবং আগুন তাদের কোমর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, আর কিছু লোক এদের চাইতেও খারাপ ও কঠিন অবস্থায় থাকবে এবং আগুন একেবারে তাদের গলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

(١٣٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى النَّارِ حَيَّاتٍ كَاَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَ اِنَّ فِى النَّارِ عَقَارِبُ كَاَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُؤْكَفَةِ تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا *(رواه احمد)

১৩৩। আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে এমন সাপ রয়েছে, যেগুলো দেহাকৃতিতে বুখতী উটের মত বড়। (যে বুখতী উট সাধারণ উটের চেয়ে বিরাট দেহী হয়ে থাকে।) এগুলো এমন বিষাক্ত যে, এর একটি কোন জাহান্নামীকে একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে এর বিষযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। অনুরূপভাবে জাহান্নামে এমন বিচ্ছু রয়েছে, যেগুলো পালনবাঁধা খচ্চরের ন্যায়

বিরাটকায়। এগুলোও এমন বিষাক্ত যে, এর একটি কোন জাহান্নামীকে একবার দংশন করলে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এর বিষযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। —মুসনাদে আহমাদ

(١٣٤) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَاَنْتَنَ اَهْلُ الدُّنْيَا * (رواه الترمذى)

১৩৪। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'গাস্সাক' (অর্থাৎ, জাহান্নামীদের ক্ষত স্থান থেকে নিঃসৃত পুঁজ যা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী জাহান্নামীদের চরম ক্ষুধার সময় তাদের খাবার হবে, এটা এমন দুর্গন্ধময় যে,) এর এক বালতি পরিমাণও যদি এ দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে সারা জগদ্বাসী এর দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। —তিরমিযী

(١٣٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَءَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قَطَرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامُهُ * (رواه الترمذى)

১৩৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে, মুসলিম (অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগত বান্দা) না হয়ে তোমরা মরবে না।" এরপর তিনি (আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করা প্রসঙ্গে) বললেন ঃ 'যাক্কূম' (যার প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে যে, এটা জাহান্নামে উৎপন্ন এক প্রকার গাছ এবং এটা জাহান্নামীদের খাবার হবে)-এর একটি ফোঁটা যদি এই দুনিয়ায় ছিটকে পড়ে, তাহলে পৃথিবীতে বসবাসকারী সবার জীবনোপকরণ বিনষ্ট করে দেবে। অতএব, ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হবে, যার খাবারই হবে এই যাক্কূম ? —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, যাক্কূম এমন দুর্গন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত জিনিস যে, এর একটি ফোঁটাও যদি আমাদের এ পৃথিবীতে পড়ে যায়, তাহলে এখানকার সকল জিনিস এর দুর্গন্ধে ও বিষাক্ততায় ভরে যাবে এবং আমাদের সকল খাবার সামগ্রী তথা জীবন ধারণের সকল উপাদান বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই ভাবনার বিষয় যে, এই যাক্কূম যাকে খেতে হবে, তার অবস্থা কি হবে ?

(١٣٦) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَبْكُوْا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا فَتَبَاكُوْا فَاِنَّ اَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِي النَّارِ حَتّٰى تَسِيْلُ دُمُوْعُهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ كَاَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلُ الدِّمَاءُ فَتَقْرَحُ الْعُيُوْنُ فَلَوْ اَنَّ سُفُنًا اُزْجِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ * (رواه البغوى فى شرح السنة)

১৩৬। হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা (আল্লাহ্ এবং তাঁর আযাবের ভয়ে) খুব বেশী করে কাঁদ। আর যদি তোমরা এরূপ করতে না পার, তাহলে অন্ততঃ কান্নার ভান কর। কেননা, জাহান্নামীরা জাহান্নামে গিয়ে এমন কাঁদবে যে, তাদের অশ্রু তাদের মুখের উপর এভাবে গড়িয়ে পড়বে, মনে হবে এটা পানির নালা। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে তাদের অশ্রু শেষ হয়ে যাবে এবং এর স্থলে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করবে। তারপর (এ রক্তক্ষরণের দরুণ) তাদের চোখে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে যাবে। (এরপর এই ক্ষত স্থান থেকে আরো বেশী রক্ত বের হবে, তখন জাহান্নামীদের এই অশ্রু ও রক্তের পরিমাণ এমন হবে যে,) সেখানে যদি অনেকগুলো নৌকা চালিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অনায়াসে চলতে পারবে। —শরহুস্ সুন্নাহ, বগভী হতে

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামে এমন কষ্ট ও আযাব হবে যে, চোখ অশ্রুর ভান্ডার শেষ করে দিয়ে রক্ত বর্ষণ করবে। এ অব্যাহত কান্নার ফলে চোখে ক্ষতের সৃষ্টি হবে। তাই সেখানের এ কষ্ট ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য এবং অশ্রু ও রক্তের সাগর প্রবাহিতকারী কান্না থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের উচিত, এখানেই নিজের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করে কেঁদে নেওয়া। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি এখানে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদবে, সে কখনো জাহান্নামে যাবে না।

যাহোক, আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদা, আর কান্না না আসলে কান্নার আকৃতি ধারণ করা, এ বিষয়টি আল্লাহ্র রহমতকে নিজের দিকে টেনে আনার এক বিশেষ ওসীলা হয়ে থাকে এবং এটা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার বিশেষ আমলসমূহের মধ্যে অন্যতম।

(١٣٧) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ اَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَمَازَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى لَوْ قَامَ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا سَمِعَهٗ اَهْلُ السُّوْقِ وَحَتّٰى سَقَطَتْ خَمِيْصَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ * (رواه الدارمى)

১৩৭। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁর এক ভাষণে) বলতে শুনেছি ঃ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সাবধান করে দিয়েছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করে দিয়েছি। তিনি এ বাক্যটি বার বার বলে যাচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী সাহাবী নু'মান ইবনে বশীর বলেন ঃ (তিনি কথাটি এমন উচ্চ আওয়াজে বলছিলেন যে,) তিনি যদি এ স্থানে থাকতেন, যেখানে এখন আমি রয়েছি এবং এখান থেকে বলতেন, তাহলে বাজারের লোকেরাও তাঁর কথাটি শুনতে পেত। (আর এ কথা বলার সময় তিনি এমন আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন যে,) তাঁর গায়ের চাদরটি নিজের পায়ের কাছে পড়ে গেল। —দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন ভাষণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে বিশেষ ভাব ও অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেত। সাহাবায়ে কেরাম এসব ভাষণ বর্ণনা করার সময় ঐ বিশেষ ভাব ও অবস্থাও বর্ণনা করার চেষ্টা করতেন। আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত নু'মান ইবনে বশীর যে এত বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, এতে তাঁর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে,

তিনি লোকদেরকে বলে দিতে চান যে, এ ভাষণ দানের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি অন্যদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন।

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়

(١٣٨) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ * (رواه البخارى ومسلم)

১৩৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামকে কাম ও ভোগ-বিলাস দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে, আর জান্নাতকে কষ্ট ও কঠিন কঠিন বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, পাপাচার অর্থাৎ যেসব আমল মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়, এগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ মনের খাহেশ ও ভোগের বিরাট উপাদান থাকে। পক্ষান্তরে পুণ্য কাজ অর্থাৎ যেসব আমল মানুষকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেয়, সেগুলো সাধারণতঃ মানবমনের জন্য কঠিন ও ভারী হয়ে থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি নফ্সের খাহেশ ও কাম প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অপরদিকে আল্লাহ্‌র যে বান্দা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কষ্ট বরদাশত করবে এবং প্রবৃত্তির দাসত্বের জীবন অবলম্বনের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান পালনের কঠিন জীবন অবলম্বন করবে, সে জান্নাতে তাঁর অবস্থান লাভ করে নিতে পারবে।

পরবর্তী হাদীসে এ বাস্তব বিষয়টিই অন্য এক শিরোনামে এবং কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(١٣٩) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهْوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَبْقٰى اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا * (رواه الترمذى و ابوداؤد والنسائ)

১৩৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন জান্নাতকে সৃষ্টি করলেন, তখন জিবরাঈলকে বললেন, তুমি যাও এবং সেটা দেখে আস (যে, আমি কি সুন্দর করে সেটা তৈরী করেছি এবং কি কি নেয়ামত সেখানে প্রস্তুত রেখেছি।) নির্দেশমত জিবরাঈল সেখানে গেলেন এবং জান্নাত ও জান্নাতের

মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সুখের যেসব উপকরণ তৈরী করে রেখেছেন, এর সবকিছু দেখলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে আল্লাহ্র দরবারে ফিরে এসে বললেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনার মর্যাদার কসম! (আপনি জান্নাতকে যেমন সুন্দর করে বানিয়েছেন এবং এতে সুখের যেসব উপকরণ তৈরী করে রেখেছেন, এতে আমার তো মনে হয়,) যে কেউ এর অবস্থার কথা শুনবে, সে-ই সেখানে পৌঁছে যাবে। (অর্থাৎ, এর অবস্থার কথা শুনে সে মনেপ্রাণে এর প্রত্যাশী হয়ে যাবে এবং সেখানে পৌঁছার জন্য যেসব নেক আমল করা উচিত, সে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে সেসব আমল করে যাবে এবং যেসব বদ আমল থেকে বিরত থাকা উচিত, সেগুলো থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। আর এভাবে সে সেখানে পৌঁছেই যাবে।) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ জান্নাতকে কষ্ট ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন জিনিস দিয়ে পরিবেষ্টন করে দিলেন (অর্থাৎ জান্নাতের চতুর্দিকে শরীঅতের বিধান পালনের বেড়া লাগিয়ে দিলেন, যা মনের কাছে খুবই কঠিন ও ভারী অনুভূত হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে পৌঁছার জন্য তাঁর বিধান পালনের ঘাঁটি অতিক্রম করে যাওয়ার শর্ত আরোপ করে দিলেন।) তারপর জিবরাঈলকে বললেন ঃ এখন আবার যাও এবং ঐ জান্নাতকে (এবং তার চতুষ্পার্শ্বে নতুন করে লাগানো বেড়াটিকে) দেখে আস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিবরাঈল আবার গেলেন এবং জান্নাতকে দেখলেন। এবার তিনি ফিরে এসে বললেন, হে আমার রব! আপনার মর্যাদার কসম! এখন তো আমার এই আশংকা যে, সেখানে কেউ যেতে পারবে না। (অর্থাৎ, জান্নাতে যাওয়ার জন্য শরীঅতের বিধান পালনের ঘাঁটি অতিক্রম করে যাওয়ার যে শর্ত আপনি আরোপ করেছেন, এটা প্রবৃত্তির অনুসারী মানুষের জন্য এমন ভারী ও কঠিন যে, কেউ এটা পূরণ করতে পারবে না। তাই আমার ভয় হচ্ছে যে, এ জান্নাত কেউই হয়তো লাভ করতে পারবে না।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যখন জাহান্নামকে সৃষ্টি করলেন, তখন জিবরাঈলকে বললেন ঃ যাও এবং জাহান্নামকে (এবং এর ভিতর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও কষ্টের যেসব উপকরণ আমি তৈরী করেছি, সেগুলো) দেখে আস। নির্দেশমত জিবরাঈল সেখানে গেলেন এবং গিয়ে সবকিছু দেখলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, হে আমার রব! আপনার মর্যাদার কসম! (আপনি তো জাহান্নামকে এমনভাবে তৈরী করেছেন আমার ধারণা হচ্ছে যে,) যে কেউ এর অবস্থা শুনবে, সে কখনো সেখানে প্রবেশ করবে না। (অর্থাৎ, এমন কাজের ধারেকাছেও যাবে না, যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে কাম ও ভোগের বস্তু দিয়ে পরিবেষ্টন করে দিলেন। (অর্থ এই যে, প্রবৃত্তির চাহিদার ঐসব কর্মকান্ড, যেগুলোর মধ্যে মানুষের মন ও নফসের খুব আকর্ষণ থাকে, জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে এগুলোর একটা বেড়া দিয়ে দিলেন। এভাবে জাহান্নামের দিকে যাওয়ার জন্য একটা বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গেল।) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন, এখন আবার গিয়ে জাহান্নামকে দেখে আস। নির্দেশমত জিবরাঈল আবার গেলেন এবং জাহান্নামকে (এবং এর চতুষ্পার্শ্বে কাম-ভোগের বেড়াকে) দেখলেন। এবার জিবরাঈল সেখান থেকে ফিরে এসে নিবেদন করলেন ঃ হে আমার রব! আপনার মর্যাদার কসম! এখন তো আমার আশংকা হচ্ছে যে, সবাই এখানে এসে যাবে। (অর্থাৎ, যে কাম ও ভোগের বস্তু দ্বারা আপনি জাহান্নামকে পরিবেস্টন করে দিয়েছেন, এগুলোর প্রতি প্রবৃত্তি-পূজারী মানুষের এমন বিরাট আকর্ষণ রয়েছে যে, সেখান থেকে বিরত থাকাই কঠিন হবে। এ জন্য ভয় হচ্ছে যে,

সকল আদম-সন্তানই এই আকর্ষণে পরাজিত হয়ে জাহান্নামে চলে যায় কিনা।) —তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য এবং এতে আমাদের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমরা যেন জেনে নেই যে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ যা বাহ্যত খুবই মজাদার ও আকর্ষণীয়, এর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি, যার একটি মুহূর্ত সারা জীবনের সুখের কথা ভুলিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র বিধান পালনের জীবন যার মধ্যে আমাদের প্রবৃত্তি কাঠিন্য অনুভব করে, এর শুভ পরিণতি হচ্ছে জান্নাত, যেখানে চিরকালের জন্য এমন সুখ ও আনন্দের উপকরণ রয়েছে, দুনিয়ার কোন মানুষের গায়ে যার বাতাস পর্যন্ত লাগেনি।

(١٤٠) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا * (رواه الترمذى)

১৪০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জাহান্নামের মত ভয়ঙ্কর কোন বিপদ দেখিনি, যে বিপদ থেকে পলায়নকারী কেউ ঘুমিয়ে থাকে। আর আমি জান্নাতের মত আকর্ষণীয় ও প্রিয় কোন বস্তু দেখিনি যার প্রত্যাশী হয়ে কেউ ঘুমিয়ে থাকে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের স্বভাব এই যে, যখন সে কোন বিপদ থেকে (যেমন আক্রমণকারী কোন হিংস্রপ্রাণী থেকে অথবা পশ্চাদ্ধাবনকারী কোন শত্রু থেকে) জীবন বাঁচানোর জন্য পলায়ন করে, তখন সে পালাতেই থাকে, যে পর্যন্ত সে আশংকামুক্ত না হয়। বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে নিদ্রাও যায় না, বিশ্রামও করে না। অনুরূপভাবে কেউ যখন কোন প্রিয় বস্তু ও আকর্ষণীয় জিনিস লাভের জন্য সাধনা করে, তখন সে মাঝপথে নিদ্রাও যায় না এবং আরামের সাথে বসেও না।

কিন্তু জাহান্নাম ও জান্নাতের ব্যাপারে মানুষের আশ্চর্য অবস্থা! জাহান্নামের চেয়ে ভয়াবহ কোন বিপদ নেই; কিন্তু যাদের সেখান থেকে বাঁচার জন্য দৌড়ে পালানো উচিত, তারা অলস-নিদ্রায় শুয়ে থাকে। আর যে জান্নাত লাভ করার জন্য মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা সাধনা করা উচিত, সেই জান্নাতের আকাঙ্ক্ষীরাও গভীর নিদ্রায় বিভোর।

এক অভিশপ্ত নিদ্রা আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, আমরা কসম খেয়ে নিয়েছি যে, হাশর পর্যন্ত আর চোখ খুলব না।

১ম খন্ড সমাপ্ত